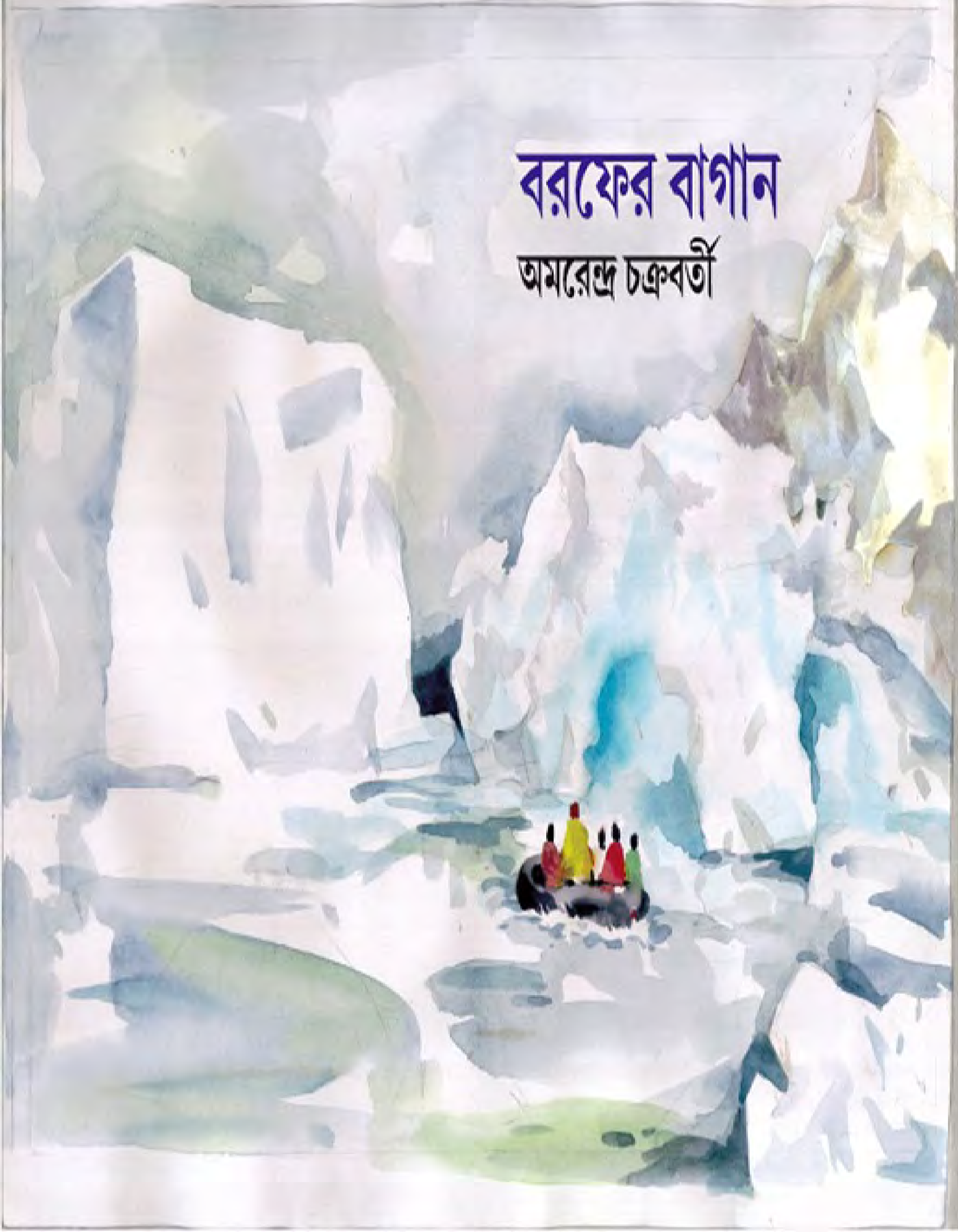
বরফের বাগান

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী




বরফের বাগান
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বরফের বাগান

বরফের বাগান

অমরেন্দ্র চ. বর্তী

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

Barafer Bagan
A novelette for teenagers by Amarendra Chakravorty
Published by Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১
দেশে ফেরার সংযোজিত পর্বসহ
প্রথম ই-বুক সংস্করণ ২০১৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ISBN : 81-86891-72-2

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন ২২৮০-৮৮১৮ ফ্যাক্স ২২৮৭-৬৪৪৮
ই-মেল books@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট www.swarnakshar.in

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা বাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উ ৎ স র্গ

আন্টার্কটিকায় একবার ছুটন্ত জোডিয়াক থেকে
সমুদ্রে পতনের মুখে, আর-একবার প্রায় তুষারসমাধি থেকে
যিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন,
এই বই তাঁকেই উৎসর্গ করলাম ।

লেখকের অন্যান্য বই

ছো ট দে র ব ই

শাদা ঘোড়া

ঋষিকুমার

হীরু ডাকাত

আমাজনের জঙ্গলে

গৌর যাযাবর

পাখির খাতা

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

তালগাছের ডোঙা

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

হরিণের সঙ্গে খেলা

আমার বনবাস

ভূতের বাঁশি

ভ্র ম ণে র ব ই

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ

গ ল্পে র ব ই

নিমফুলের মধু

ক বি তা র ব ই

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা

উ প ন্যা স

বিষাদগাথা

সূচি

১

জাহাজ ছাড়বার কথা পাঁচটায়, সে. সাতটা বেজে গেল, জাহাজের ভোঁ আর বাজে না। অনেকক্ষণ থেকে মাইকে ক্যাপ্টেনের একই ঘোষণা শোনা যাচ্ছে- একজন যাত্রী এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি, তিনি আসছেন বহু দূরের দেশ থেকে, ঝড়জলে তাঁর বিমান আফ্রিকার কোনও বন্দরে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল, তিনি বারবার বার্তা পাঠাচ্ছেন, তাঁর আন্তরিক অনুরোধ, তাঁকে ফেলে জাহাজ যেন ছেড়ে না দেয়। তাঁর দেরির জন্য যদি জাহাজ কোম্পানির কোনও ক্ষতি হয় তা তিনি পুষিয়ে দেবেন।

রাত পৌনে-আটটায় আবার ক্যাপ্টেনের গলা- সেই যাত্রীর বিমান বুয়েনস আইরেস ছেড়ে এসেছে, যে-কোনও সময় উশুয়াইয়া বিমানবন্দরে নামবে। আশা করা যায় আর এক ঘন্টার মধ্যে তিনি নিশ্চিতই জাহাজে উঠবেন। তিনি ওঠামাত্র জাহাজ রওনা হবে।

আমাদের জাহাজের নাম পোলিয়ার্নে অরলোভা। জাহাজে চারটে ডেক। লোয়ার ডেক, মেইন ডেক, আপার ডেক আর ক্যাপ্টেন্স ডেক। পাঁচতলায় ব্রিজ।

জাহাজ ছাড়ল রাত ঠিক নটা বারো মিনিটে। আমি পাঁচতলার ব্রিজ থেকে উশুয়াইয়ার তীরভূমির ছবি তোলায় এতটাই মগ্ন ছিলাম যে আচমকা জাহাজের ভোঁ শুনে ঝাঁকুনি খেয়ে গেলাম। ক্যামেরাসুদ্ধু হাত নড়ে গিয়ে শটটাই নষ্ট হয়ে গেল।

রাত প্রায় সওয়া নটাতেও আন্দিজ পাহাড়শ্রেণীর মাথায়, তার ওপরের আকাশে সূর্যাস্তের গাঢ় কমলা রং লেগে আছে। স্থির হয়ে বাকি দুটো ভোঁ শুনতে শুনতে উশুয়াইয়ার রাঙা আকাশের নীচে তীরভূমির সদ্য আলো-জ্বলা ঘরবাড়ি, রাস্তার ছবি তুলতে তুলতে বিগল চ্যানেল ধরে ক্রমশ পুবদিকে এগিয়ে চললাম। আলোকিত তীরভূমিও ছোট হতে হতে তুলির একটা টানের মতো সরু দেখাল। একসময়ে মানুষের ঘরবাড়ির সেই শেষ রেখাটাও মুছে গেল।

দিন-দুয়েক একটানা চলার পরই আমাদের জাহাজ বরফে ঢাকা সমুদ্রে পড়বে। তাতে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। ১৯৭১ সালে রাশিয়ায় তৈরি এ জাহাজ সমুদ্রের বরফ কাটতে কাটতে এগোতে পারে।



আমরা চলেছি আন্টার্কটিকায় । জমাট বরফের মহাদেশ দেখবার টানে এই শখের অভিযাত্রীদলে নানা দেশের মানুষ একসঙ্গে এসে মিলেছেন । এরকম যাত্রী বা অভিযাত্রী ৬৬ জন, তাছাড়া জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিক, কুক, রেডিও অফিসার, পরিচারক-পরিচারিকা ইত্যাদি ৬০ জন, এছাড়াও অভিযান পরিচালনার জন্য আরও ১৬ জন বিশেষজ্ঞ ধরে মোট লোকসংখ্যা ১৩২ ।

জাহাজ ক্রমশ দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে ।

আমি আলাস্কা থেকে দেশে ফিরে এবার চলেছি আন্টার্কটিকায় । সেই একই চ্যানেলের জন্য ভিডিও ছবি তুলতে- এবার আন্টার্কটিকা ভ্রমণের তথ্যচিত্র । ভ্রমণ না বলে অভিযান বললেই কথাটা বেশি ঠিক হয় ।

আলাস্কা থেকে কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসব, আবার আন্টার্কটিকার পথে পাড়ি দেব- কিছুদিন আগেও এ ছিল আমার স্বপ্নের অতীত । আলাস্কার উত্তরতম অঞ্চলে চারদিকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট গভীর বরফের রাজ্যে, প্রবল তুষারপাতে পুরো শীতকালটা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করে দেশে ফিরেছি মনে পড়লে নিজেই অবাক হয়ে যাই । হাতে-পায়ে তুষারক্ষত নিয়েও মোট পনেরোটা এক্সপোজড ক্যাসেট অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, সেটাই আনন্দের । কেননা আমার সেই অসম্পূর্ণ 'আলাস্কা' টিভির দর্শকদের ভালো লেগেছে, শুনলাম ছ-মাসের মধ্যে ওই চ্যানেলে মোট পাঁচবার ছবিটা দেখানো হয়েছে । আমি জানি, ছবিটা খুবই দুর্বল । একা হাতে, বেশিরভাগই ট্রাইপড ছাড়া, ছবি তোলা যায় নাকি? তবু টিভি-দর্শকদের ভালো লাগছে, তার কারণ ঘরে বসে তারা ওই দূর দুর্গম অঞ্চল একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ।

আন্টার্কটিকায় কতটা কী করতে পারব জানি না। আন্টার্কটিকা অনেক বেশি দুর্গম, অনেক বেশি কঠিন। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে শীতল, সবচেয়ে শুষ্ক, সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন, সবচেয়ে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার এই মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই কঠিন বরফে ঢাকা।

জনবসতিহীন এমন ভয়ানক ঠান্ডা আর প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে গ্লেসিয়ার, আইসবার্গ আর সীমাহীন তুষারভূমির সাম্রাজ্যে আমি একা একটামাত্র ছোট ক্যামেরা নিয়ে টিভির জন্য ছবি তুলতে কেনই বা রাজি হলাম ভেবে মাঝে মাঝে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে আসে! তবে একাজে রাজি না হলে আন্টার্কটিকা আসবার টাকাই বা আমাকে কে দিত!

টাকার ব্যবস্থা চ্যানেলের জন্য সম্ভব হলেও আমার দুর্গম আন্টার্কটিকা অভিযানের স্বপ্ন সত্যি হবার মূলে কিন্তু নিউজিল্যান্ডবাসী বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রী হোয়েলার স্কট। ইন্টারনেটে দক্ষিণমেরু অভিযানের একটা ওয়েবসাইটে আমি তাঁর মেরু অভিযানের বিস্ময়কর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা পড়ে তাঁর সঙ্গে ই-মেলেই যোগাযোগ করি। তিনি সবরকম তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে আমি এই দুর্লভ অভিযানের হদিশই পেতাম না। কবে কোথা থেকে অভিযান শুরু হবে, কতদিন ধরে তা চলবে, কতটা বিপদসঙ্কুল, আমি এতে অংশ নিতে পারি কিনা, কত খরচ ইত্যাদি সবই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন।

আমাদের এই আন্টার্কটিকা অভিযানের নেতা হোয়েলার স্কট। তিনিই সেই বিখ্যাত দক্ষিণমেরু-অভিযাত্রী রবার্ট ফ্যালকন স্কটের বংশধর কিনা এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এমনিতে আন্টার্কটিকা অভিযান সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান বা এই অভিযানের ইতিহাস বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই, তবে এপথের ঐতিহাসিক অভিযাত্রী শ্যাকলটন-স্কট-আমুন্ডসেনের কথা আমি স্কুলে থাকতেই পড়েছি।

দুঃসাহসিক, অভিজ্ঞ, মধ্যবয়সি হোয়েলার একইসঙ্গে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অভিযান করেছেন। একদিকে যেমন উত্তরমেরু ছুঁয়ে ফেরার পথে সভালবার্দ, স্পিৎসবারজেন আর লংইয়ারবিয়েনের বরফরাজ্যে শ্বেত ভালুকদের বিচরণক্ষেত্রে তিনি তেরোদিন কাটিয়েছেন, আরেকদিকে আবার দক্ষিণমেরু বিন্দুর তিনশো মাইলের মধ্যে তুষারক্ষেত্রে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তিনি একেবারে একা বাস করে এসেছেন। আমাদের যেমন শীত শেষ হয়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে বসন্ত শুরু হয়, তারপরই আসে গ্রীষ্মকাল, আন্টার্কটিকায় তার উল্টো, মার্চ-এপ্রিলে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শুরু হয় শীত। আকাশে তখন সূর্য বলে কিছু নেই, সমুদ্রও জমে বরফ। সমগ্র দক্ষিণমেরু অঞ্চলই তখন জমাট বরফ। সেইসময় হোয়েলার সেখানে তিন মাস ছিলেন!

আমরা আন্টার্কটিকায় যাচ্ছি নভেম্বরের মাঝামাঝি। আর্জেন্টিনার বন্দর-শহর উশুয়াইয়া থেকে জাহাজ রওনা হল উনিশে নভেম্বর। ছ-সপ্তাহ আন্টার্কটিকা ঘুরে, দক্ষিণমেরুবৃত্তের

যতটা সম্ভব ভেতরে গিয়ে আবার পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের শহর এই উশুয়াইয়ায় ফিরে আসব এমনই কথা আছে।

তবে কেউ সাংঘাতিক অসুস্থ হলে, জরুরি চিকিৎসার জন্যও তাকে উশুয়াইয়ায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারও মৃত্যু হলে তার শবদেহও দেশে ফেরাবার ব্যবস্থা নেই। চুক্তিপত্রে এরকম আরও কয়েকটি ভয়-পাওয়ানো শর্ত দেখেও অভিযান শুরুর বহু আগেই সব যাত্রীকে সম্মতি জানিয়ে ছাপানো ফর্মে সই করে দিতে হয়েছিল।

২

জল শুধু জল । আমাদের জাহাজ ক্রমশ আদি-অন্তহীন মহাসমুদ্রে এগিয়ে চলল ।

এই জাহাজ আর জাহাজের সঙ্গে উড়ে চলা অ্যালবাট্রস আর পেট্রেল পাখির ঝাঁক ছাড়া কোথাও কিছু নেই । সমুদ্রও দেখতে দেখতে নীলবর্ণ ছেড়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল । জাহাজের মাইকে অভিযানের নেতা হোয়েলার স্কটের ঘোষণা শোনা গেল- আমরা এখন চল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পার হয়ে যাচ্ছি ।

দ্বিতীয় দিন মাঝরাতে সমুদ্র ফুলে উঠল । তবে কি সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে? আলমারি ও টেবিলের সবকটা ড্রয়ার মেঝেতে ছিটকে পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছে । জাহাজ একবার একাত, একবার ওকাত । প্রচণ্ড দুলছে । আচমকা আশঙ্কায় জেগে উঠে জাহাজের একদিকের জানলা দিয়ে দেখি একবার জাহাজ কাৎ হয়ে ঢেউয়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ছে, আরেকবার সোজা আকাশে । একবার আমার চোখ সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, পরের মুহূর্তেই দেখছি গোধূলির মতো আলোময় আকাশে সাদা মেঘের পাল । তার মধ্যে আবার একেকবার একদিকেই এত বেশিক্ষণ কাৎ হয়ে থাকছে যে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে । মনে আতঙ্ক, জাহাজ এই বুঝি উল্টে গেল!

এপথের কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজে পড়িনি তো? তাহলে তো ড্রেক প্যাসেজের ভয়াবহ রূপ ক্যাসেটবন্দি করার সুযোগ বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দেওয়া যায় না! এক হাতে শক্ত করে ক্যামেরা ধরে, কখনও দেওয়াল ঘেঁষটে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেভিগেশন রুমের মাথায় ব্রিজে পৌঁছে আতঙ্কে মন অসাড় হয়ে যায় । জাহাজের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম পাশাপাশি দুলুনি, এখন দেখছি একেবারে সামনেই জাহাজের মুখটা একেকবার যেন হাই জাম্প দিয়ে ঢেউ ছেড়ে সোজা আকাশে উঠে গিয়ে পরের মুহূর্তেই জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে । যতই রেলিং ঠেসে দাঁড়াবার চেষ্টা করি কেউ যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে চাইছে । তার মধ্যেই ক্যামেরা চালু করে শক্ত হাতে ধরে আছি । প্রবল হাওয়া আর সাংঘাতিক ঢেউয়ের সঙ্গে এ এক অসম লড়াই । যে-কোনও সময় হয়তো আমাকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে, তবু এমন কল্পনাতীত সব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার উত্তেজনায় আমি যেন পাগল হয়ে গেছি!



মাইকে প্রথমে ক্যাপ্টেনের তারপর হোয়েলারের সতর্কবাণী শোনা গেল- আমরা ভয়াবহ ড্রেক প্যাসেজে পড়েছি । গতকালই যেমন সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল সেইমতো আশা করি সবাই টেবিল ও আলমারির সব ড্রয়ার খুলে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছেন । কেউ বিছানা ছেড়ে উঠবেন না, কেউ দাঁড়াবেন না ।



হায়, ছবি তোলায় মগ্ন থাকায় কাল আমি এই সতর্কবার্তা শুনিনি ।

ক্যাপ্টেন ঘন্টাখানেক পরে আবার জানালেন, আমরা চেষ্টা করছি ড্রেক প্যাসেজের প্রবল হাওয়া যাতে আমাদের জাহাজকে ধাক্কা দিয়ে উল্টে না ফেলে বা অন্য পথে না নিয়ে যায় । আবার বলছি, আপনারা কেউ বিছানা ছেড়ে উঠবেন না । কেবিনের বাইরে যাবার

চেষ্টা করবেন না। ধৈর্য ধরুন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। লক্ষ দৈত্যের এই আক্রমণ আমরা প্রতিহত করবই। এটাই ড্রেক প্যাসেজের স্বভাব। ভয় পাবেন না।

আন্টার্কটিকা যাওয়া পাকা হয়ে যাবার পর কলকাতা ছাড়বার আগেই যখন আন্টার্কটিকা নিয়ে যেখানে যতটুকু যা জানা যায় জানবার চেষ্টা করছিলাম, তখনই এই ড্রেক প্যাসেজের কথা জেনেছি। এখানে এই প্যাসেজ একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সিস ড্রেক নামে একজন ইংরেজ নাবিক প্রথম এই সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। তাঁর নামেই এই প্যাসেজের নাম।

প্রায় দু-আড়াই কোটি বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকা আর আন্টার্কটিকার মধ্যে এই একটা সমুদ্রব্যবধান তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর কোথাও কোনও ভূখণ্ড না থাকায় ড্রেক প্যাসেজ বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম ঢেউ আর আদি-অন্তহীন উন্মাদ হাওয়ায় সবসময়ই ভয়াবহ রূপ ধরে থাকে।

ড্রেক প্যাসেজ পার হবার সময় আমরা দুই সমুদ্রের সঙ্গম বা আন্টার্কটিক কনভারজেন্স অতিক্রম করে আন্টার্কটিকা মহাদেশে প্রবেশ করলাম। এখানেই প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলেছে। উত্তরের শীতল জল আর দক্ষিণের উষ্ণ জলের মধ্যে এ যেন একটা স্পষ্ট ভেদরেখা।

পরদিন খাবার ঘরে দেখা গেল ব্রেকফাস্টের সব টেবিল ফাঁকা। শুধু একজন এক হাতে দুটি স্লাইস রুটি ও দুটি-তিনটি সসেজ নিয়ে খাবার সাজিয়ে রাখা টেবিলেই ভর দিয়ে, জাহাজের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে খালি চেয়ারের দিকে এগোবার বৃথা চেষ্টা করছেন। টেবিলের ওপাশ থেকে পরিচারিকারা অভয় দিয়ে চলেছেন- সব টেবিলেই জাহাজের দুলুনি ঠেকানো ম্যাট পাতা আছে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। তিনজন চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছেছেন বটে, তবে সামনের টেবিলে দুহাতে কফির কাপ-ডিশ আগলে রাখার চেষ্টাতেই এত ব্যস্ত যে চুমুক দেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। মেঝের সঙ্গে নাট-বল্টু দিয়ে আটকানো টেবিল-চেয়ারসুদ্ধুই জাহাজ মাতালের মতো টলছে।

আমি আগেরদিন থেকে বমি-মাথা ঘোরার ট্যাবলেট শুরু করে দিয়েছিলাম। আজ সকালে জাহাজের আইরিশ ডাক্তারের পরামর্শে পাউরুটিতে বেশি করে মাখন লাগিয়ে কলা ও গ্রিন টি সহযোগে কোনওক্রমে প্রাতরাশ সেরে নিতে পেরেছি। যদিও খাবার টেবিল পর্যন্ত পনেরো পা যেতে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা। প্রায় সব চেয়ার-টেবিল ফাঁকা, দুয়েকজন বাদে কেউই খেতে আসেনি। এখানে আসবার পথে দেখলাম সব বন্ধ কেবিনের দরজায় ঝোলানো বমি করার প্লাস্টিকের খালি প্যাকেটগুলো আর বিশেষ খালি নেই।

পরশু মাঝরাতে শুরু হয়ে আজ দুপুর পর্যন্ত সমুদ্রের এই তাণ্ডব চলল। বেলা আড়াইটে নাগাদ জাহাজের ভয়াবহ দুলুনি কমে এল। আরও ঘন্টাখানেক পর পরিস্থিতি

স্বাভাবিক হয়ে এলেও অবেলার মধ্যাহ্নভোজে অল্প কয়েকজনকেই দেখা গেল।

রাতে এর বিপরীত ছবি। জাহাজের ডাইনিং হলে নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা মুখ, নানা পরিধানের যেন এক মহাসম্মেলন। একেকটা টেবিলে ছ-আটজন করে বসেছেন। আন্টার্কটিকা যাবেন বলে সকলের মনেই বেশ উত্তেজনা। সকলেরই বাসনা, পেঙ্গুইনদের স্বদেশ আর হিমবাহ-হিমশৈলের স্বর্গরাজ্য স্বচক্ষে দেখবেন। অনেকেরই খাবার টেবিলে পরস্পরের সঙ্গে দিব্যি চেনাজানা হয়ে গেল। অথচ একবেলা আগেও কেউ কাউকে চিনতেন না।

যাঁর জন্য জাহাজ ছাড়তে দেরি হয়েছে অনেকেই আন্দাজে একে ওকে তাকে সেই ব্যক্তি ভেবে সহানুভূতি জানাতে লাগল। কেউ কেউ বিলম্বের কারণ নিয়েও বিশদ শুনতে চায়। যতক্ষণ না জানা যাচ্ছিল এই ব্যক্তি সে ব্যক্তি নয়, ততক্ষণ তার ভাগ্যে এরকম অযাচিত সহানুভূতি জুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হল সেই আসল ব্যক্তিটি খাবার ঘরেই আসেননি। ফলে যা ছিল নিছক একটা কৌতূহল, তা-ই ক্রমশ সংশয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

সন্দেহজনক একজন যাত্রীর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। জাহাজে ওঠার আগের রাতে বন্দরের কাছেই উশুয়াইয়ার যে হোটেলে ছিলাম, সকালে সেখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে নির্দেশমতো আমার লাগেজ ঘরের সামনে বের করে রেখে, জাহাজে বমি-মাথা ঘোরার প্রতিষেধক স্টুজোর্ন আর ডমস্ট্যাল ট্যাবলেট কিনতে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন ওষুধের দোকানের সামনে দুজন অচেনা লোকের আলোচনা কানে এসেছিল। মনে হয় তারা বন্দরের গোয়েন্দা-পুলিশ। চুরুট খেতে খেতে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল। ওই ভাষাটা আমি বেশ কিছুটা বুঝতে পারি। তাদের কথা থেকে ঝাপসামতো এইটুকু বুঝেছিলাম যে আজ আন্টার্কটিকাগামী জাহাজের একজন যাত্রীর গতিবিধি কিছুটা সন্দেহজনক। তাঁর আন্টার্কটিকা অভিযান নিছক ওই শ্বেত মহাদেশ দেখার জন্য নয়। অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। তিনি অন্যদের মতো জাহাজ ছাড়ার আগের দিন উশুয়াইয়ার হোটেলে থাকার জন্য ঘরও বুক করেননি।

ওষুধ কেনার ছলে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ভালো দেখায় না, তাছাড়া আমার তখনও হাঁটুজলে ও বরফে হাঁটার রবারের জুতো ভাড়া নেওয়া বাকি।

যে মেয়েটির দোকান থেকে পায়ের মাপমতো জুতো ভাড়া নিয়েছি তাকেই পরে জাহাজে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মেয়েটি বিকেল পর্যন্ত জুতো ভাড়া দেবার দায়িত্বে ছিল, সন্ধে থেকে জাহাজে ডিউটি। আসলে যে সংস্থাটি এই অভিযানের আয়োজক, জুতো ভাড়া দেবার দোকানও তাদের। মেয়েটি সেই সংস্থারই কর্মচারী। অভিযানের আগে জুতোর দোকানের কাজ শেষ করার পর শুরু হয় তার জাহাজের ডিউটি। প্রতিদিন যাত্রীদের

কেবিন সাফসুতরো রাখার গুরুদায়িত্ব যাদের, সে সেই কর্মীবাহিনীর নেত্রী । তাছাড়া বিলম্বে আসা বিশেষ যাত্রীটির দেখাশোনার দায়িত্বও নাকি তাকেই দেওয়া হয়েছে ।

মেয়েটির নাম মারিয়া । তার কাছেই আমি এসব কথা জেনেছি । আমি টিভির জন্য ছবি তুলতে এসেছি শুনে সে গালে হাত দিয়ে চোখ গোল করে ফরাসিদের মতো এমনভাবে 'ও লা লা' বলে উঠল, যেন এর চাইতে বেশি অবিশ্বাস্য আর কিছুই হয় না ।

অজানা জিনিস নিয়েই বোধহয় মানুষ সবচেয়ে বেশি কথা বলে । একবার শোনা গেল এই রহস্যময় যাত্রীটি নাকি নেপালের রাজপ্রাসাদের প্রধান পুরোহিত । পরে এ সংবাদের আরও শাখাপ্রশাখা ছড়াল । একজন বললেন ইনি আসলে কম্বোডিয়ার বিস্ময়কর প্রাচীন আঙ্কোরভাটের পুরোহিতদেরই বংশধর, নেপালে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন । আঙ্কোরভাট মানে আঙ্কোর-মন্দির । আর সব ছেড়ে মানুষটা বিশিষ্ট কোনও পুরোহিতই বা কেন হতে যাবেন সেও এক ধাঁধা ।

এক জার্মান তরুণী ভদ্রলোককে একেবারে সামনা-সামনি দেখেছেন, তিনি বললেন, 'রাজপুরোহিত কিনা জানি না, তবে কোনও মোঙ্গোলিয়ান রাজপুরুষ হওয়া খুবই সম্ভব । আমি মোঙ্গোলিয়ার নানা অঞ্চলে ঘুরেছি, ওঁর মুখের আদল ওদেশের অভিজাত পুরুষদের মতো ।'

কে তিনি, কেনই বা তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক, তাঁকে দেখতেই বা কেমন- এইসব জানতে আমাকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যতদিন না মহাসমুদ্রের বুকে প্রথম দ্বীপ দেখতে পেয়ে 'ল্যান্ড হো!' বলে সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিল । ঠিকমতো বলতে গেলে, প্রথম দ্বীপ দেখতে পাবার মুহূর্তে নয়, সেই দ্বীপে ল্যান্ডিংয়ের সময় আমি প্রথম তাঁর দেখা পাই ।

তখনও জানতাম না শুধু এই রহস্যময় ব্যক্তিটিই নয়, আরও সন্দেহজনক ও সাংঘাতিক দুজন যাত্রীও আমাদের সঙ্গে আন্টার্কটিকা চলেছে । নীচের ডেকে লোহার খাঁচায় ছ-সাতটা হাস্কি কুকুরও নাকি তাদের । এই জাহাজে যাত্রীপিছু যা ভাড়া, কুকুরের জন্য তার দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে কুকুরগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটাও অনেক পরে জেনেছি । ভীষণ চেহারার এতগুলো কুকুর সঙ্গে নিয়ে কেউ আন্টার্কটিকা কেন যাচ্ছে সেই রহস্য ভেদ করার মুহূর্তগুলোর চেয়ে বেশি ভয়ানক সময় আমার জীবনে আর আসেনি ।



৩

ডাইনিং হলে দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষা টেবিলগুলো থেকে হঠাৎ কোরাসের মতো একটা চিৎকার শুনে বাকিরা প্রায় সবাই আমরা গোলাকার জানলাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। যা দেখলাম তা আমাদের মতো ডাঙার প্রাণীদের পক্ষে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্র যেন আদিগন্ত বরফের মাঠ, তাতে সবে ফাটল ধরেছে। চৈত্র মাসে বাংলার মাঠ-খেত যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায় পুরো সমুদ্রের জমাট বরফও তেমনি যতদূর চোখ যায় ফেটে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে আছে।

লাঞ্চ টেবিলেই একজনের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি নিজে না বলে দিলে আমার পক্ষে তাঁকে আফগানিস্তানি বলে মেনে নেওয়া সম্ভবই ছিল না। গোঁফ-দাড়ি কামানো ব্যক্তিত্বময় মুখ, লম্বা মেদহীন চেহারার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলায় দেখা কলকাতার দাড়ি-পাগড়িময় কাবুলিওয়ালার একতিল মিলও নেই। তাঁর পরিষ্কার ইংরিজি শুনেও প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিলাম।

নানা কথার মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি হঠাৎ আন্টার্কটিকায় যাচ্ছেন কেন? দীর্ঘকাল ধরে নিজের রুক্ষ পাহাড়ি দেশের যুদ্ধ-মারামারি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে এবার চলেছেন পেঙ্গুইন আর তুষারভাস্কর্যের সৌন্দর্য দেখতে?'

ভদ্রলোক প্রথমে মাথা নামিয়ে যেন খাবার প্লেটে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে থেকে কোনও চিন্তায় ডুবে গেলেন, খানিকক্ষণ এরকম নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে থেকে মুখ খুললেন। ধীর গলায় বললেন, 'বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ভাঙার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই? আফগানিস্তান থেকে বুদ্ধ উচ্ছেদের ভাবনা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত।'

বলে আবার ভদ্রলোক নিজের ভেতরে ডুব দিলেন। আমিও মনের দুর্বিষহ বিস্ময় চেপে রেখে নিঃশব্দে সুপ খেতে লাগলাম।

'বামিয়ানের বুদ্ধের চোখদুটি তুমি কি কখনও দেখেছ? ছবিতে, বা কোনও ভাস্কর্যে? মানুষের অমন চোখ সহজ কথা নয়। পাহাড়ের গুহায় বুদ্ধের ওই সুপ্রাচীন মূর্তিটি ভাঙার পর থেকেই ওই আশ্চর্য চোখ আমার মনে গেঁথে গেছে। প্রথমে দিনের বেলা হঠাৎ হঠাৎ ওই চোখ আমার মনে ভেসে উঠত। তারপর কী দিন, কী রাত- সবসময় চোখদুটি আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার ঘুম পর্যন্ত ছুটে গেল। সারারাত মনে হত আমি যেন একটানা স্বপ্নে ওই চোখ দেখেই কাটাচ্ছি।'





আবার নীরব, সেই নিজের মধ্যে ডুব ।

আমার মুখেও কথা নেই ।

আবার সেই একইরকম ধীরে ধীরে শুরু করলেন, 'আমার নানার আব্বার লেখা একটা পুঁথি ছিল, পুস্তু ভাষায় আগাগোড়া হাতে লেখা পুঁথি, বুদ্ধের অনেক উপদেশ খুব সহজ করে বলা ছিল সেই পুঁথিতে । সেই পুঁথি ছিল আমার নানির কাছে একটা পাথরের বাক্সে, সবুজ রঙের পাথরের বাক্স । খুব আশ্চর্যের কথা- বুদ্ধমূর্তি ভাঙা যেদিন শেষ হল, সেদিন রাতে সেই পুঁথি কী করে জানি না আমার চোখে পড়ল । পুরো পুঁথিটা আমি দুবার পড়লাম, ভোর না হয়ে গেলে হয়তো আরও পড়তাম । আমাদের মতো সাধারণ মানুষের

সুখ-দুঃখ নিয়ে, তার কার্যকারণ নিয়ে এত ভেবেছিলেন বুদ্ধ আমার কোনও ধারণাই ছিল না ।'

তিনি আবার থামতে আমি শুধু অপেক্ষা করে রইলাম । এবারও নিজে থেকেই শুরু করলেন, 'তাঁর চোখদুটি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগল । খুব গোপনে প্রথমে পাকিস্তানে পরে সেখান থেকে ভারতে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম । এই পালিয়ে বেড়ানো- আমার আফগানিস্তানের সঙ্গীদের কাছ থেকে, নাকি আমার নিজের কাছ থেকে জানি না ।

'ভারতের গয়া, কাশী, সারনাথ ঘুরে নেপালের লুম্বিনিতে বুদ্ধের জন্মস্থানে কিছুদিন কাটিয়েছি । কিছুতেই আমার মনের অশান্তির আর উপশম হল না । এখন চলেছি আন্টার্কটিকায় । শুনেছি সেখানে কোনও মানুষ নেই, তাই মানুষে মানুষে হানাহানিও নেই । এতদিনে একটা কথা বুঝেছি, আমার এই অশান্তি, এই অনিদ্রার মূলে মানুষের মধ্যে হানাহানি, হত্যা, হিংসা, ধ্বংস । শুধু তো আফগানিস্তানের পাহাড়-প্রান্তর নয়, আমার বুকের পাঁজর, হৃদয়ের অন্তস্তলও ছিল হত্যার হুংকারে ভরা । বুদ্ধের শান্ত চোখদুটি সবসময় আমাকে যেন এইসব ভয়াবহ হত্যা হিংসা হানাহানির কুফলের কথা বলেই চলেছে ।'

হঠাৎই আমার মনে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা প্রশ্ন ছুটে এল, ইনিই সেই সবচেয়ে দেরিতে আসা রহস্যময় আগন্তুক নন তো? আমি সেই প্রশ্নই করলাম, 'আপনি তাহলে ভারত থেকে আসছেন? ভারতের মুম্বই থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারে জোহানেসবার্গ সাওপাওলো হয়ে বুয়েনস আইরেস এসেছেন? আপনার বিমান ঝড়ে সাউথ আফ্রিকায় কোথাও নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল? আপনিই কি বারবার জাহাজ না ছেড়ে দেবার অনুরোধবার্তা পাঠিয়েছিলেন?'

'না, না । আমি উশুয়াইয়ায় এসেছি আঠেরোই নভেম্বর । জাহাজ তো ছাড়ল উনিশে ।'

এই সময় হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল- আপনাদের বাঁদিকে দেখুন । খুবই অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছেন কিছু? বিরাট একটা কুঁজওলা উটের মতো ওই দূরে একটা আইসবার্গ ভেসে চলেছে ।

প্রথম আইসবার্গ অর্থাৎ হিমশৈল দেখতে যাত্রীদের অনেকেই জানলার দিকে, অনেকে আবার বাইরে জাহাজের পিছনদিকে বোতে চলে গেলেন ।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের মধ্যেই হোয়েলারের উল্লসিত ঘোষণা- ডানদিকে দেখুন, আপনাদের ডানদিকে! দ্বীপ দেখা যাচ্ছে! ল্যান্ড, ল্যান্ড! ওখানেই আমরা প্রথম ল্যান্ড করব!





অমনি যাত্রীদের মধ্যে থেকে এলোমেলোভাবে বেসুরে চিৎকার উঠল- ল্যান্ড হো! ল্যান্ড হো! ল্যান্ড হো!

আধঘন্টার মধ্যেই দেখা গেল সত্যিই একটা দ্বীপ । বলে না দিলে দ্বীপ বলে চেনাই যেত না । সাদা বরফের ঢিবি ছাড়া কিছু মনেই হয় না ।

আরও কিছুক্ষণ পর জাহাজ জলের বুকেই স্থির হল । আর পাঁচতলার রেলিংয়ের গায়ে আটকে রাখা তিনটে জোডিয়াক বা মোটর লাগানো রবারের ডোঙা এমনভাবে জলে নামানো হল যেন আকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে নেমে এল । প্রথম ডোঙা নামালেন দলপতি হোয়েলার, আকাশ থেকে ডোঙার ওপর দাঁড়িয়ে সোজা নেমে এলেন । পরেরটি একইভাবে নামালেন দক্ষ জোডিয়াক-চালক ভাজিক চানতুরিয়া । তৃতীয় জোডিয়াক নিয়ে

যিনি নেমে এলেন শুনলাম তিনি একজন হিমবাহ বিশেষজ্ঞ। সবশেষে একইভাবে আরও তিনটি জোডিয়াক সমুদ্রে নেমে এল।

ইতিমধ্যে তিনতলার ডেক থেকে জাহাজের গা বেয়ে হালকা একটা সিঁড়ি নামানো হয়েছে, একেবারে নীচে দুজন বলবান লোক শক্ত হাতে সিঁড়ির শেষ প্রান্ত ধরে আছে। এক এক করে যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে জোডিয়াকে উঠছেন, আমিও এক হাতে ক্যামেরা, এক হাতে নড়বড়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে সাবধানে নীচে জলের দিকে নামছি, মনে হচ্ছে ভারী ভারী সব পোশাকের নীচে সারা শরীরে যেন বরফের চাদর জড়ানো। কেবিন থেকে বেরিয়ে, জাহাজের ভারী লোহার দরজা ঠেলে বাইরে সিঁড়ির মুখে পৌঁছনোমাত্রই প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন জাপটে ধরে। অথচ এয়ারকন্ডিশনড কেবিনে আরামদায়ক ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডায় একটার ওপর আরেকটা পোশাক চড়াতে চড়াতে গরমে ঘেমে উঠেছিলাম। প্রথমে পশমের ড্রয়ার, পশমের ফুলহাতা আঁটো গেঞ্জি, তার ওপর গলা অব্দি হাওয়ারোধক পোশাক, তার ওপর আপাদমস্তক পার্কা। পায়ে প্রথমে সিল্কের, তার ওপর পশমের মোজা, তার ওপর তুষারে হাঁটার উপযুক্ত হাঁটু অব্দি রবারের জুতো। হাতেও দুপ্রস্থ দস্তানা, একটা উলের, তার ওপরেই আরেকটা চামড়ার, আর মাথায় অধিকাংশেরই বিদেশি সিনেমায় দেখা ঘন তুষারপাতের মধ্যে সৈনিকদের মতো ঠান্ডা-আটকানো টুপি। আমি পরেছিলাম প্রায় সারা মুখ ঢাকা, ঠাসবুনোট উলের তৈরি আমাদের হনুমান-টুপি। সকলের চোখেই আলট্রা ভায়োলেট রে থেকে চোখ বাঁচাবার কালো চশমা। প্রত্যেককেই বারবার বলে দেওয়া হয়েছে কোনও অবস্থাতেই যেন চশমা না খোলা হয়। এমনকি এই চশমা ছাড়া ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়েও দেখা নিষিদ্ধ।

যে দুজন সিঁড়ির শেষ প্রান্ত শক্ত করে ধরেছিল তারা মৃদু হেসে আমার হাতে ধরা ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করে জানাল ক্যামেরা বা অন্য কিছু সঙ্গে নিতে হলে পিঠে রুকস্যাক নিতে হবে। জোডিয়াকে বসবার সময় যাতে দুটো হাতই খালি থাকে। জোডিয়াকের দুই কিনার বরাবর একটানা মোটা দড়ি বাঁধা আছে, সবসময়ই যে যার পিছনের দড়ির অংশটি শক্ত করে দুহাতে ধরে থাকতে হবে। আমার পিঠে রুকস্যাক নেই। অগত্যা ক্যামেরাটা পার্কা-র পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। অন্য পকেটে একস্ট্রা ক্যাসেট ও একটা স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি।

টাল সামলে জোডিয়াকে গিয়ে বসতেই সিঁড়ির মাথায় উত্তেজিত উচ্চস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি সিঁড়ির মাথায় যে দুজন কর্মী একে একে প্রত্যেক যাত্রীকে দরকারি উপদেশ দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে সাহায্য করছেন তাঁরা একজন যাত্রীকে আটকে দিয়েছেন, তাঁকে জোডিয়াকে নেওয়া হবে না। প্রথমত, লোহার দরজা ঠেলে জাহাজের বাইরে আসার মুখে দেওয়ালে ঝোলানো যাত্রীদের নাম ও কেবিন নম্বরের পাশে যেখানে 'আমি স্বেচ্ছায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছি' লেখার নীচে নাম সই করে আসতে হয়, দেখা গেল সেখানে এই যাত্রী নাম

সই করেননি । আরও একটা মারাত্মক অপরাধ- ইনি খুব বড় মাপের ব্যাগ নিয়েছেন, সেটা আবার পিঠে না বেঁধে হাতে করে, কখনও বয়ে কখনও টেনে নিয়ে এসেছেন । একে তো বড়, তার ওপর নিয়মবিরুদ্ধভাবে বওয়া ব্যাগ পরীক্ষা করতে যেতেই যাত্রীটি বিরক্ত হয়ে ওঠেন । কর্মীদুজন জোর করে ব্যাগ খোলা মাত্রই ওই যাত্রী নিজের ভাষায় গম্ভীর স্বরে তাঁদের তিরস্কার করতে থাকেন । নীচে জোডিয়াকে বসে স্পষ্ট কানে এলেও শুধু এই বুঝলাম যে এ ভাষা আমি কখনও শুনিনি, সিঁড়ির মাথার কর্মীদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, তাঁদের কাছেও এ ভাষা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য । তবে তিনি তিরস্কারই করুন আর আপত্তিই জানান, তাঁর কথার ভঙ্গিতে ও গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে আমি ছাড়াও কেউ কেউ তাঁর দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম ।

যাত্রীটিকে শেষ পর্যন্ত জাহাজের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে নাম সই করিয়ে বড় ব্যাগসুদ্ধুই নীচে নামতে দেওয়া হল ।

জোডিয়াকে উঠে বসার পর জোডিয়াক-চালক বিনীতভাবে জানতে চাইলেন- 'এত ভারী ব্যাগে কী নিয়ে যাচ্ছেন? আপনাকে নিশ্চয়ই মিঃ হোয়েলার স্কট বুঝিয়ে দিয়েছেন- জোডিয়াক থেকে প্রথমে আপনাকে একহাঁটু জলের মধ্যে নামতে হবে । সেই জল ভেঙে বরফে ঢাকা দ্বীপে গিয়ে উঠবেন । কঠিন বরফ আর প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার জন্য যে দ্বীপে প্রথম নামবার কথা ছিল আমরা সেখানে নামতে পারিনি আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

এতক্ষণে শুধু আমি নয়, জোডিয়াকের অন্যান্য যাত্রীও বুঝে নিয়েছি- ইনিই সেই রহস্যময় যাত্রী, এঁরই জন্য উশুয়াইয়ায় আমাদের চার ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে ।

জোডিয়াক-চালকের কথা শেষ হবার আগেই পরিষ্কার ইংরিজিতে ভদ্রলোক বললেন, 'প্লিজ কোয়েঞ্চ দ্য থার্স্ট অব ইয়োর কিউরিয়স মাইন্ড (আপনার কৌতূহলী মনের তৃষ্ণা মেটান) ।' বলতে বলতে নিজেই ব্যাগ খুলে ধরলেন । দেখা গেল তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো অচেনা জিনিসপত্র ছাড়াও বেশ ভারী একটা যন্ত্র রয়েছে । দেড়-দুহাত লম্বা, হাতখানেক চওড়া, নানারকম মিটার লাগানো অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র ।





যন্ত্রটির চেয়েও মানুষটির মুখ আমাকে বেশি আকৃষ্ট করল । ইনি নিশ্চয়ই কোনও এশীয় দেশের মানুষ । কখনও মনে হয় যেন আমাদের মণিপুরের অধিবাসী, কখনও মনে হয় তাইল্যান্ডের, অথবা হয়তো ফিলিপিনো । কেন জানি না, তাঁর মুখের ওপর আমার দৃষ্টি যেন আটকে গেছে । ধরি ধরি করেও ঠিক ধরতে পারছি না- ইনি কোন দেশি, কোন জাতি, কোন ভাষাভাষী? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল ইনি কোনও তিব্বতি বণিক বা সে-দেশের ধর্মীয় নেতা নন তো?

হঠাৎ বড় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জোডিয়াক চালু হল । আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোকের চোখ পড়ল আমার ওপর । জোডিয়াক ছোট ছোট আইসবার্গ বা হয়তো

সমুদ্রের ভাঙা বরফটুকরোর ওপর দিয়ে অনেকটা ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে ।

এই সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না । দড়ি ছেড়ে দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে কোমর বেঁকিয়ে জলের ওপর যতটা সম্ভব ঝুঁকে ছবি তুলতে লাগলাম । ওই অবস্থায় আমার চোখে পড়ল অল্প দূরে বিরাট একটা গ্লেসিয়ার- যেন সমুদ্রফুঁড়ে উঠেছে । জোডিয়াক সেদিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা ভুলে কালো চশমা ঠেলে কপালে তুলে দিয়ে ক্যামেরা তাক করলাম ।

জোডিয়াক-চালক লাফ মেরে আমার কাছে এসে ধমক দিয়ে বেশ কড়া গলায় বললেন, 'বসুন, বসে পড়ুন । জলে পড়লে আমরা আপনাকে তুলে নেব ঠিকই, কিন্তু তাতে আপনার কিছু যাবে-আসবে না, কেননা এই বরফজলে দশ-পনেরো মিনিট হাবুডুবু খেলে শরীরের রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে আপনি আর বেঁচে থাকবেন না ।'

তা বলে এইরকম দৃশ্যের সামনে ক্যামেরা বন্ধ রেখে বসে থাকা যায়? এ শুধু কষ্টের নয়, যন্ত্রণার । হঠাৎ দেখি সেই ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে আছেন । সন্দেহ হচ্ছে তিনি হয়তো অনেকক্ষণ এইভাবেই আমার মুখে কিছু একটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন ।

ঠিক তাই-ই । আমি যখন আরেকবার ক্যামেরা বাগাবার ফাঁক খুঁজছি, ভদ্রলোক হঠাৎই আমাকে বললেন, 'আই হ্যাভ সিন ইউ বিফোর । প্লিজ হেলপ মি আইডেনটিফাই ।' (তোমাকে আমি এর আগে দেখেছি । ঠিক চিনতে পারছি না, একটু সাহায্য করো তো ।)

৪

ভদ্রলোকের কথা শুনেই আমার চোখের সামনে থেকে নিমেষে একটা পর্দা সরে গেল । বছর কয়েক আগে আমি এক দেশের এক রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে-দেশের রাজা তাঁর প্রধানমন্ত্রীর একটা কাজ একেবারেই পছন্দ করেননি । প্রধানমন্ত্রীর সেই ভুলে রাজ্যে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসময় রাজা তাঁর বৃদ্ধা মায়ের উপদেশে প্রধানমন্ত্রীকে এই বলে শিক্ষা দিয়েছিলেন- যে শাস্তি নিজেকে দেওয়া যায় না সেই শাস্তি অন্যকে দেওয়া উচিত নয় । ঘটনাটি ছিল এই- দেশের হাজার হাজার গরিব মানুষ পেটের দায়ে বে-আইনি জেনেও ড্রাগ চোরাচালানকারীদের উসকানিতে লুকিয়ে-চুরিয়ে আফিম চাষ করছিল, প্রধানমন্ত্রী তা কিছুতেই দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন । সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে এক সপ্তাহে বাইশ হাজার দরিদ্র প্রজাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল । তাই নিয়ে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ।

শেষ পর্যন্ত তা সামাল দিয়েছিলেন রাজা স্বয়ং, কেননা তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, মায়ার জন্য তাঁকে দেশের লোক ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করত ।

এ যুগের সত্যিকার কোনও রাজাকে নিয়ে একটা আধুনিক রূপকথা লেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের । যেসব দেশে এখনও রাজার শাসন চালু আছে সেসব দেশের রাজারাজড়ার খবর পড়া আমার একটা নেশা ।

এই দেবতুল্য রাজার কথা পড়ে আমার রূপকথা লেখার ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে উঠেছিল । বিনীতভাবে আমার সেই ইচ্ছে জানিয়ে সে-দেশের রাজাকে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি লিখে বসলাম ।

তিন মাস অপেক্ষা করেও কোনও উত্তর না পেয়ে আবার চিঠি লিখি । এরপরও কোনও উত্তর না আসায় আমি অস্ট্রেলিয়ার এক আদিবাসী রাজার বংশধরকে নিয়ে লেখা আমার একটা ছোট গল্পের ইংরিজি অনুবাদ রাজাকে পাঠিয়ে শেষবারের মতো মাত্র তিন ঘন্টার জন্য তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি ।

এইবার সে-দেশের বিদেশসচিব আমাকে রাজার সানুগ্রহ সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখেন । সেইমতো বিদেশসচিবের নির্দেশ অনুসারে জুন মাসের এক সকালে আমি সে-দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে জানতে পারি যে প্রতিবেশী রাজ্যের কোনও বিশেষ অতিথিকে নিয়ে রাজা সেদিনই সকালে রাজধানী ছেড়ে তাঁর শীতকালীন প্রাসাদে চলে গেছেন ।

বিদেশসচিব আমাকে এও জানালেন যে সেখানে আগামীকাল বিকেল চারটেয় রাজা আমাকে দর্শন দেবেন। আমার যাবার ব্যবস্থাও বিদেশমন্ত্রক করে রেখেছেন। রাজার শীতকালীন প্রাসাদ রাজধানী থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে, পার্বত্য এলাকায়, একেবারে পাহাড়ের গায়ে।

পরদিন যথাসময়ে সেখানে পৌঁছনোমাত্র রাজার দুজন অফিসার এসে আমাকে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে ছোট অথচ ভারি সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। পুরো প্রাসাদটি কাঠের তৈরি। এই ঘরটিও কাঠের। আগাগোড়া সূক্ষ্ম কারুকার্য করা।

এত দূর আসতে পেরেছি, বসে বসে নিজের সেই ভাগ্যের কথা ভাবছি, এমন সময় তিনজন সঙ্গী নিয়ে স্বয়ং রাজা ঘরে ঢুকে আমার দিকে এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি অবাক হবারও সময় না পেয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ভেঙে রাজাকে অভিবাদন জানালাম। রাজা মুখে ভারি নির্মল হাসি নিয়ে হাত ধরে আমাকে বসালেন ও নিজে সিংহাসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গের তিনজনের দুজন রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে গেলেন। একজন রয়ে গেলেন, তিনি বসলেন রাজার ডানদিকে একটা সুসজ্জিত চেয়ারে। তিনিই এখন জোডিয়াকে, আমার কাছে জানতে চাইছেন আমাকে তিনি কোথায় দেখেছেন।

আমার চোখের সামনে থেকে একের পর এক পর্দা সরে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, রাজা আমাকে বলেছিলেন- তুমি যদি এযুগের রাজাকে নিয়ে রূপকথা লিখতে চাও তাহলে আমার নয়, এঁর জীবনকাহিনি তোমার জানা দরকার। ইনি আমার প্রতিবেশী দেশের অত্যন্ত বিদ্বান ও গুণবান যুবরাজ। আমার জ্যোতিষী স্বয়ং এঁর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন এঁর সন্ন্যাসযোগ প্রবল। যদি সত্যিই একালের রাজার সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাও এঁর কথাই তোমার জানা দরকার।

সেবার শেষ পর্যন্ত আমার রূপকথা লেখা হয়নি ঠিকই, তবে রাজার কথায় ব্যবহারে মন আমার কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। রাজার নির্দেশে, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, রূপকথা লিখি বা না লিখি তাঁর দেশের নাম বা তাঁর প্রতিবেশী এই বন্ধু যুবরাজের দেশের নাম আমি কখনও প্রকাশ করব না।

সেই যুবরাজই কি তবে সন্ন্যাসী হয়ে আন্টার্কটিকা যাচ্ছেন? তিনি কি এখনও যুবরাজ, না রাজা? এই মুহূর্তে আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক দেখে ভেতরের মানুষটিকে বোঝার উপায় নেই।

বরফে ঢাকা একটা দ্বীপের সামনে জোডিয়াক এসে থেমেছে। একে তো বরফে ঢাকা, তার ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতো তুষারপাত হচ্ছে। সকলেই একে একে জলে নেমে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দলনেতা হোয়েলার আগেই এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি বরফের ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে প্রথম স্থলভূমি, বা বলা ভালো, তুষারভূমি স্পর্শ

করার জন্য স্বাগত জানিয়ে বললেন- 'ওয়েলকাম টু হাফমুন আইল্যান্ড ।' এই সুযোগে যুবরাজ (জানি না এখনও তিনি যুবরাজ, নাকি রাজা) আমার কাছে এসে মৃদু স্বরে আমাকে বললেন, 'তোমাকে দেখে আনন্দ হল । তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ।'

দ্বীপের ভেতরদিকে অল্প এগোতেই চোখে পড়ল শত শত পেঙ্গুইন । এ হয়তো পেঙ্গুইনদের বসতি, বা ক্রীড়াঙ্গন । খেলছে, না মারামারি করছে জাহাজের পেঙ্গুইন বিশেষজ্ঞের কাছে জানতে হবে । আপাতত কখনও ঝুঁকে, কখনও তুষারে হাঁটু গেড়ে বসে ক্যামেরা চালাতে লাগলাম । চারদিকের এইসব আশ্চর্য দৃশ্য ক্যাসেটবন্দি করতে করতে আমি নিজেই যেন দৃশ্যের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে গেছি ।

আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল এই দ্বীপে আমরা আধঘন্টা থাকব । কেউ যেন বেশি দূরে না যান । যাত্রীদের মধ্যে একজন হালকা গোলাপি রঙের পার্কা পরে এসেছেন, তাঁকেও বারবার বলে দেওয়া হয়েছে একেবারেই অন্যদের চোখের আড়ালে না যেতে । নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকেরই গাঢ় লাল বা গাঢ় হলদে রঙের পার্কা পরে থাকা চাই, কেননা কেউ কোনও দ্বীপে বা ধু ধু তুষারক্ষেত্রের কোথাও হারিয়ে গেলে ধবধবে তুষারের ওপর দূর থেকে শুধু গাঢ় রং দেখেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে । জোডিয়াক থেকে দ্বীপে নামার জায়গাটাও সবাইকে ভালো করে চিনে রাখতে হবে ।

হাফমুন আইল্যান্ড থেকে ফেরার সময় ছটি জোডিয়াক কয়েকবার করে ট্রিপ দেওয়া সত্ত্বেও হিসেব করে দেখা গেল আরও নজন তখনও দ্বীপে রয়ে গেছেন । শেষ জোডিয়াক শেষবারের মতো জাহাজের উদ্দেশে ফিরে আসার সময় আবিষ্কার করা হল সেই যুবরাজ এখনও বেপাত্তা । তিনি যে এর আগেই ফিরে যাননি সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত । কে তাঁকে কোথায় খুঁজবে সে বিষয়ে কর্মীদের সকলেরই মনে সংশয় ।

জোডিয়াকের শেষ ট্রিপের যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজে ফিরে আসতে আসতে তাঁর হদিশ না মেলার খবরে আমার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে টের পেলাম ।

তাঁকে না নিয়ে তো আর নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না । নাকি আবার উশুয়াইয়ার মতো সকলকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে! শুনলাম শেষ পর্যন্ত এই ঠিক হয়েছে যে আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে বাছাই করা কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মী নিয়ে দলনেতা নিজে এই জোডিয়াকে চড়ে দ্বীপে ফিরে আসবেন ও তন্নতন্ন করে সেই যুবরাজকে খুঁজবেন । সেজন্য তিনি তুষারে ডুবে যাওয়া বা তুষাররাজ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষ উদ্ধারে অভিজ্ঞ একজনকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন ।





আমি যখন দ্বীপ ছেড়ে জোডিয়াকে উঠি তখন তুষারপাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে এসেছি । এই জাহাজের কর্মীরা অনেকে যেমন জাহাজের নানা কাজের দায়িত্বে আছেন, অনেকে আবার অভিযান পরিচালনার জন্যই এসেছেন । এঁদের কেউ আন্টার্কটিকার পেঙ্গুইন বা অন্যান্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ, কেউ বা এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে চরম জ্ঞানী, কেউ হিমবাহ বিশেষজ্ঞ, কেউ আবার শীতের আলাস্কা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আন্টার্কটিকায় আসা পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে পণ্ডিত ।

আমি জাহাজে ফিরে এসে বেশ খানিকক্ষণ উৎকণ্ঠায় কাটাবার পর জানতে পারলাম যে সেই নিরুদ্দেশ যাত্রীর দেখা মিলেছে ও তাঁকে নিয়েই জোডিয়াক ফিরে এসেছে ।

ক্রমশ আরও জানা গেল, দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে একটা তুষার-পাহাড়ের আড়ালে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, অথবা আত্মগোপন করেছিলেন । সেখানে তাঁর দেখা পাবার সময় তিনি তাঁর রহস্যযন্ত্রটি নিয়ে কোনও কিছুর হদিশ পাবার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন ।

হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল, আজ আরও একটা দ্বীপে নামবার চেষ্টা করা হবে । এই দ্বীপটির নাম ডিসেপশন আইল্যান্ড । সকলকে অনুরোধ করা হল তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে আবার দ্বীপে নামবার পোশাকে তৈরি হয়ে নিতে ।

সবে নিয়মমতো রাসায়নিক মেশানো জলে পা ধুয়ে কেবিনে ঢুকে ভারী পোশাক-আশাক বদলাতে শুরু করেছি, আবার খেয়ে উঠেই সেসব গায়ে-মাথায় চড়াতে গলদঘর্ম হতে হবে ভেবে একটু অস্বস্তিই লাগল ।

ডাইনিং হলে যাবার জন্য কেবিনের দরজা খোলার আগেই যে ব্রাজিলিয়ান মেয়েটি রোজ আমার কেবিন পরিষ্কার করতে আসে সে একটা চিরকুট দিয়ে গেল ।

চিরকুটে লেখা: ডিসেপশন আইল্যান্ডে না নামলে খুব বেশি কিছু মিস করবে না । তার চেয়ে বরং লাঞ্চ সেরেই 'আমুন্ডসেন' স্যুইটে চলে এসো ।

যিনি লিখেছেন, তাঁর নাম লেখা নেই । তা সত্ত্বেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ সেই যুবরাজের লেখা । তাছাড়া হাতের লেখাতে একটা বেশ ব্যক্তিত্ববান স্টাইল আমার নজর এড়াল না । সত্যি বলতে কী, 'আমুন্ডসেন' স্যুইট যেন একটা চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল ।

ডাইনিং হলে যথারীতি যুবরাজকে দেখা গেল না । হয়তো বিশেষ কোনও ব্যবস্থায় নিজের কেবিনে বসেই তিনি আহারপর্ব সেরে নেন ।

অন্য সকলে যখন খাওয়ার মাঝপথে, আমি তখন তাড়াতাড়ি একটু স্যালাড আর সুপ খেয়ে আমুন্ডসেন স্যুইটের দিকে রওনা হলাম ।

এই সারির কেবিনগুলোর সামনে যে করিডর ধরে এগোতে হয়, সেই করিডরের মুখে ভারী লোহার দরজা । রীতিমতো জোরে ঠেলতে হল । ডানপাশে পরপর সব কেবিন বা স্যুইট, বাঁপাশে সমুদ্র, স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসে ঢাকা বিমানের জানলার মতো জাহাজের দেওয়ালের গোল গোল জানলা দিয়ে দেখা যায় ।

করিডরে ঢুকে দেখি পরপর দুটো কেবিনের দরজায় একজনেরই নাম লেখা । ভারি খটোমটো নাম, বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করা অসম্ভব । অর্থাৎ এই দুটি কেবিন একজনেরই । আমি 'আমুন্ডসেন' কেবিনের ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ।

রাজা বা যুবরাজ স্বয়ং দরজা খুলে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে ভেতরে আসতে বলে দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন । তারপর সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজে বসলেন ও তাঁর বাঁদিকে কিছুটা কোনাকুনি একইরকম আরেকটা সোফায় আমাকে বসতে ইশারা করলেন । তাঁর এই কেবিন আমার কেবিনের মতো ছোট নয় । যে ঘরে

এসে ঢুকলাম, সেটা একটা আসবাবপত্রে সাজানো ড্রয়িংরুম, বেশ বড় মাপের । পর্দার ওপারে আরও একটা ঘর, বোধহয় বেডরুম । এটা আসলে একটা স্যুইট । পাশাপাশি এরকম দুটো স্যুইট নিয়ে রাজা কী করছেন কে জানে । দুটো স্যুইটের মধ্যে যাতায়াতের ওই দরজাটাই বা কেন?

আমি এই প্রথম রাজাকে বা যুবরাজকে সামনে ঝুঁকে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'আমি কি অমুক দেশের রাজাকে নমস্কার ('স্যালুট') করছি, নাকি সে দেশের যুবরাজকে? নাকি রাজসিংহাসনত্যাগী সন্ন্যাসীকে?'

রাজা বা যুবরাজের মুখে মৃদু হাসি ফুটল । ধীর স্বরে বললেন, 'এবার তোমাকে চিনেছি । এখনকার কোনও রাজাকে নিয়ে তুমি ভারতীয় ভাষায় রূপকথা লিখতে আমার বন্ধুর দেশে গিয়েছিলে না?'

মুখে হাসি ফুটিয়ে এবার আমার নীরব থাকার পালা ।

'বোসো, তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি । দেখা হয়ে হয়তো ভালোই হল । প্রথমে বলো, তুমি কেন আন্টার্কটিকায় যাচ্ছ?'

আমি সোফায় বসে পড়ে বললাম, 'ছোটবেলা থেকেই নতুন অঞ্চল, নতুন মানুষ, নতুন দেশ দেখতে আমি ব্যাকুল । সেরকম সুযোগ পেলেই তা আঁকড়ে ধরি ।'

'আন্টার্কটিকা অভিযানের সুযোগ পেলে কী করে?'

'আমাদের কলকাতার একটা টিভি চ্যানেলে আন্টার্কটিকা ভ্রমণের ভিডিওচিত্র তৈরি করে দেবার শর্তে এখানে এসেছি । এর সব খরচ দিয়েছে সেই চ্যানেল ।'

'এটাই কি তোমার পেশা?'

'না না, সে যোগ্যতাই আমার নেই । আমি এমনিতে লিখি । মনের ভাব-ভাবনা, বনের পশুপাখি, নতুন নতুন দেশ নিয়ে লিখতে ভালোবাসি । আমার দুয়েকটা বইও লোকে ভালোবাসে । দেশভ্রমণের ভিডিও ফিল্ভম তৈরির কোনও শিক্ষাদীক্ষাই আমার নেই । আছে বলতে দেশ দেখার ব্যাকুলতা, যেখানেই যাই সেখানকার আশ্চর্য সব দৃশ্য ক্যাসেটবন্দি করা, আর তা আমার দেশের মানুষকে দেখাবার ইচ্ছে । এই তিন সম্বল করে আমি আমাজন, আলাস্কা, আফ্রিকার ওপর ভিডিও ফিল্ভম বানিয়েছি । আমাদের দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অভিজ্ঞ, প্রতিভাবান, তথ্যচিত্র-নির্মাতাদের দিয়ে এইসব দূরদেশের আদর্শ ছবি বানানোর কথা কেউ ভাবতে পারে না বলেই আমার আনাড়ি হাতের তৈরি, তৃষাতুর চোখের দেখা এইসব দুর্বল চিত্ররূপ মানুষ ভালোবেসে দেখে । টিভি চ্যানেলের প্রযোজকরা আমাকে চান, তার কারণ এমন নামমাত্র খরচে এমন দূর দূর দেশের ছবি তাঁরা পাবেন কোথায়!'

ধৈর্য ধরে শুধু নয়, রীতিমতো মন দিয়ে রাজা এমনভাবে আমার কথা শুনছিলেন যে আমিও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে নির্লজ্জের মতো অনর্গল নিজের সাতকাহন বলে গেলাম ।

এই সময় হঠাৎই আমাদের দুজনকেই চমকে দিয়ে কেবিনের ঘোষণাযন্ত্রে হোয়েলারের গলা শোনা গেল- ডিসেপশন আইল্যান্ড যাবার জন্য সবাই কিউ দিন, তার আগে নাম সই করতে ভুলবেন না। সিঁড়ির মুখে পৌঁছবার দরজা এখনই খোলা হবে।

শরীরের কোথাও মশা কামড়ালে যেমন বেখেয়ালেও সেখানে হাত চলে যায়, অনেকটা সেইরকমই সিঁড়ির মুখের দরজা খোলা হবে শুনেই আমি বোধহয় অজ্ঞাতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। রাজা তা লক্ষ করে এক হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে বললেন, 'ডিসেপশন আইল্যান্ড আসলে মৃত আগ্নেয়গিরির দ্বীপ। তোমার চোখের আরাম, মনের আনন্দ সেখানে মিলবে না। বোসো, হয়তো আরও বড় কোনও বিষয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

কী বলব, কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে থাকি।

রাজাই আবার শুরু করলেন, 'যা কিছু চোখে দেখছ, ক্যামেরায় তুলে নিচ্ছ, সেইসব দৃশ্যের বাইরে আরও অন্য দৃশ্যও তো থাকতে পারে, তাই না?'

'হয়তো আছে, হয়তো নেই। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত গভীর না।'

'আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে এই পৃথিবীতেই অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে, তুমি বিশ্বাস করো?'

এবার আমার একটু আশ্চর্য লাগল। এসব অত্যন্ত জটিল দার্শনিক ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইছেন কেন? আমি একটু ভেবেই বললাম, 'অত বড়, অত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই।'

'সিংহাসনের লোভে ভাই ভাইকে সপরিবারে হত্যা করে- এও কি বিশ্বাস করার? তা বলে কি এমন মর্মান্তিক ঘটনার পরও কেউ আর সে ঘটনা অবিশ্বাস করতে পারে?'

বছর-তিনেক আগে নেপালের রাজা বীরেন্দ্রকে একসঙ্গে সপরিবারে হত্যার ঘটনাটাই রাজা বোঝাচ্ছেন কি? তিনিও কি নেপাল-রাজবংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও আত্মীয়? বা তাঁদের প্রতিবেশী কোনও রাজ্যের রাজা? এইসব ভাবছি, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ডিসেপশন আইল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে হোয়েলারের লাস্ট কল শোনা গেল। সেটুকু সামলে নিয়ে বললাম, 'আপনি ডিসেপশন আইল্যান্ডের কথা জানলেন কী করে? এখানে আসবার আগে এইসব দ্বীপের বিষয়ে সব তথ্য জেনেই এসেছেন?'

'এর আগে আমি আরও দুবার এই পথে ঘুরে গেছি। তবে সে অন্য জাহাজে। একবার আঠেরোদিন ছিলাম, আরেকবার চব্বিশদিন। এবার তো ছ-সপ্তা থাকার কথা। এবার আন্টার্কটিকার আরও গভীরে যাওয়া যাবে।'

এই সময় দ্বিধা ঝেড়ে আমি বলে ফেললাম, 'এত দূরে, এমন দুর্গম পথে ভারী একটা যন্ত্র নিয়ে বেরিয়েছেন কেন? জিনিসটা সম্পর্কে একটু জানতে পারি কি?'

'যন্ত্রটা কিছুটা দিশি রেডারের মতো । বাদুড়ের দূরদৃশ্যের অনুভূতির সঙ্গে হাতির শ্রবণশক্তিও যন্ত্রটিতে রয়েছে । এইসব অঞ্চলে স্বভাবতই যা যা আছে, যেমন বরফ, জল, পাথর, পেঙ্গুইন, সিল বা সি-লায়ন- এইসব ছাড়া অন্য কোনও ধাতু বা বস্তু বা প্রাণী থাকলে তা এই যন্ত্রে বোঝা যায় । আবার জমাট বরফের নীচে বহু দূরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিও এ যন্ত্রে ধরা পড়ে । উত্তরমেরু অঞ্চলে এস্কিমোরা গভীর বরফের তলা থেকে সিল শিকারের জন্য একটা হাতুড়ে যন্ত্র ব্যবহার করে, জিনিসটা তাদেরই তৈরি, তাদেরই কেউ সেই স্থূল যন্ত্রটিতে ক্রমশ নানা সূক্ষ্ম ম্যাগনেটিক শক্তি জুড়ে এই যন্ত্র তৈরি করেছিল । আমি এটা আলাস্কার একটা সাপ্তাহিক হাটে পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে কিনেছি । দোকানি-মেয়েটির থুত্থুড়ে দিদিমা কিংবা ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলে আমি এই যন্ত্রটির বিষয়ে এইসব তথ্য জেনেছি ।'

'আপনি হাটে গিয়েছিলেন! তখন কি আপনি যুবরাজ, না রাজা?'

'ওসব মানুষের বাইরের পরিচয় ।'

এর বেশি আর কিছু তিনি বললেন না ।

'এই ক্রুজ বা এক্সপিডিশনের লোকেরা বা জাহাজের লোকেরা আপনার পরিচয় জানে না?'

'তাঁরা আমাকে জানেন আমার দেশের প্রাচীনতম ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হিসেবে । আর সত্যিই আমি তাই ।'

'এটা তো আংশিক সত্য ।'

'পুরো সত্য জানবার শক্তি সকলের থাকে না । হয়তো তার প্রয়োজনও হয় না ।'

আমি আরও একটু সাহস করে বললাম, 'আপনি কি এই তুষাররাজ্যে কিছু খুঁজতে এসেছেন?'

সেকথার উত্তর না দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্য একটা কথা বললেন, 'যদি এই অসীম শুভ্রতার রাজ্যে হারিয়ে যাই তাহলে হয়তো আর আমার রাজ্যে ফিরব না । তোমাকে বিশ্বাস করে সব বললাম । আমি জানি তোমাকে বিশ্বাস করা যায় ।'



৫

কী একটা উত্তেজনায় বা আশঙ্কায় রাতে ভালো করে ঘুম হল না। পরদিন খুব ভোরে উঠে ক্যামেরা নিয়ে সোজা জাহাজের পাঁচতলায় ছাদে চলে গেলাম। মনে আশা, এখানে ব্রিজ থেকে হয়তো ভোরের মহাসমুদ্রে আশ্চর্য কোনও দৃশ্য দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন্স ডেকের মাথায় ছাদের সামনের অংশটাকেই জাহাজের ব্রিজ বলে। শেষ তলার সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে গায়ের জোরে লোহার ভারী দরজা ঠেলে ছাদে পৌঁছেই আচমকা ভয়ে বুকটা ধক করে উঠল, ছাদের ওমাথা থেকে আবছা আলোয় অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি আমারই দিকে দৌড়ে আসছে।

আরও কাছে আসতে যখন আমার সারা শরীর হঠাৎই ঝিঁঝি ধরার মতো শিরশির করে উঠল ঠিক তখনই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম- ছুটন্ত ছায়ামূর্তি আসলে জাহাজের চিনা রেডিও অফিসার। দিনরাত জাহাজ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে বার্তা বিনিময়ের চেষ্টায় একঠাঁই বসে বসে তাঁর নাকি হাত-পা জমে যায়, তাই রোজ ভোরবেলা পাঁচতলার নির্জন ছাদের চারপাশে কয়েক পাক দৌড়ে নেন।

দূর থেকে ঝাপসামতো বিরাট একটা হিমশৈল ভেসে আসছিল। এতক্ষণে কিছুটা কাছে আসতে চাপা উত্তেজনায় ছাদের রেলিংয়ে ক্যামেরা বসিয়ে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্যামেরা-স্ট্যান্ড বা ট্রাইপড তো নেই, ক্যামেরার নড়াচড়া কমাতে তাই কোনও কিছুর ওপর ক্যামেরা রাখবার সুযোগ পেলে তা যতটুকু পারি কাজে লাগাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট ওই হিমশৈল এত কাছে এসে পড়ল যে ক্যামেরাকে ওইরকম চিন্তাচেতনাহীন একজায়গায় একইভাবে সেঁটে রেখে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটিকে তার স্বরূপে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল।

এবারে ক্যামেরাটা দু-হাতে ধরে, দুই কনুই বুকে চেপে রেখে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দমবন্ধ করে যে দৃশ্য দেখছি তাতে যে কারও দমবন্ধ হয়ে আসবে। দমদম থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আমাদের গোটা কলকাতা শহরটা সব ঘরবাড়িসুদ্ধু যদি অলৌকিক উপায়ে জমে বরফ হয়ে যায় আর সেটাকে কেউ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় তাহলে যেমন দেখাবে এই আইসবার্গটা তেমনই দেখাচ্ছে। তার দেওয়ালে সমুদ্র অবিরাম ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে। সাদা বরফের গায়ে সাদা ঢেউয়ের আকাশছোঁয়া লম্ভ আমার এই সামান্য হাত-ক্যামেরায়

যতটা সম্ভব জুম ইন-আউট করে কখনও ক্লোজ, কখনও লং শটে নিতে পেরে ভারি আনন্দ হল ।

রেডিও অফিসার জগিং থামিয়ে একমনে আইসবার্গটা দেখছিলেন, বললেন, 'জানো নিশ্চয়ই, আইসবার্গ জলের ওপরে যতটা দেখা যায় সেটা তার দশভাগের একভাগ মাত্র । পুরো জিনিসটা ওপরে-নীচে এর দশগুণ বড় ।'

আইসবার্গ অর্থাৎ হিমশৈল যত এগিয়ে আসছে জাহাজের দুলুনিও তত বাড়ছে । জাহাজ এগোচ্ছে হিমশৈলের দিকে, হিমশৈলও এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে । হিমশৈল যেদিক থেকে আসছে জাহাজও যাচ্ছে সেদিকেই । ফলে জাহাজ থেকে মনে হচ্ছে হিমশৈলই তার গতি বাড়িয়ে চলেছে । যেন হাজার দৈত্য শত শত ফুট লম্বা লক্ষ লক্ষ দাঁত বের করে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মনুষ্যবাহী এই জাহাজের ওপর ।

লেন্সের মধ্যে থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না । ভয়ে বুক ধক ধক করছে, আবার মরিয়া হয়ে এও ভাবছি, বাঁচবার কোনও অলীক উপায় নিশ্চয় হবে! সব ছাপিয়ে, এমন দুর্লভ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার উল্লাস চাপতে পারছি না ।

আইসবার্গটি যখন আরও কাছে এল, তখনই দেখা গেল ওটা জাহাজকে বেশ কয়েক কিলোমিটার বাঁয়ে রেখে এগিয়ে আসছে । মুখোমুখি ধাক্কা লাগার সত্যিই কোনও আশঙ্কা থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জাহাজের সাইরেন বেজে উঠত । প্রথমদিনই আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল সাইরেন শুনলেই যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় শুধু লাইফ জ্যাকেট পরে বা পরতে পরতে জাহাজের আপার ডেকে রিসেপশনের সামনে এসে জড়ো হতে হবে ।

রেডিও অফিসারও আমাকে কিছু না বলে কখন নেমে গেছেন জানতে পারিনি । বিপদের ভয় থাকলে তিনি আমাকে ফেলে রেখে যেতেন কি?

দূর থেকে আইসবার্গটাকে যতটা বিরাট দেখাচ্ছিল, জাহাজকে অতিক্রম করে চলে যাবার সময় দেখলাম এটা তার চেয়ে বহুগুণ বড় । এ তো শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আর জলের ওপরে থাকা অংশটুকু । পুরোটা সমুদ্রের ওপরে থাকলে তার আয়তন আমার কল্পনায় আসে না ।

দিনের শেষে জাহাজের মাইকে ঘোষণা করা হল- দেখুন, দেখুন, সামনেই প্যারাডাইস বে । স্বর্গ বলে যদি সত্যিই কিছু থাকে এ নিশ্চয়ই তাই । উপসাগরের নীল জলরাশির বুকে যেন হাজার হাজার দেবশিশুর অবিরাম হামাগুড়ি আর অবিরল খিলখিল হাসি । এখানকার হিমশৈলগুলোও যেন খেলায় মেতেছে । বাঁয়ে জলতরঙ্গ ফুঁড়ে উঠেছে সুদীর্ঘ হিমবাহ । জমাট বরফ-পাহাড়ের সে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা । রাত নটায় তার ওপর কমলা রঙের রোদ । শুনলাম একসময় এই প্যারাডাইস উপসাগর তিমি-শিকারিদেরও স্বর্গরাজ্য ছিল ।

জাহাজ এখানে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ছবি তুলতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে খেয়ালই করিনি সামনে এগোনোর পথ কঠিন বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। মাইকে হোয়েলারের এই ঘোষণা শুনে চেয়ে দেখি আমাদের সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে- যতদূর চোখ যায় বরফের পুরু প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে সমুদ্র যেন গুমরাচ্ছে। বরফ-কাটা জাহাজও এখানে অচল। জাহাজের রুশ নাবিক, আমাদের দলপতি আর হিমবাহ বিশেষজ্ঞ ও আন্টার্কটিকার আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মিলে ঠিক করলেন জাহাজ এপথে আর এগোবার চেষ্টাই করবে না। সেইমতো সারারাত ধরে রুট বদলে ক্রমশ ডানদিকে আমাদের জাহাজ সরতে লাগল।

অ্যাডেলাইড দ্বীপে নামবার চেষ্টা করেও নামা গেল না। যদিও সমুদ্র এখানে কিছুটা কম গভীর কিন্তু ঢেউ সাংঘাতিক। তার ওপর প্রবল হাওয়া।

এর মধ্যে একদিন জাহাজের বোতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি, মাঝে মাঝেই সমুদ্রের ঢেউ উঠে এসে হাঁটু অব্দি ভিজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা উঁচু ঢেউ আমার বাঁদিকের পাঁজরে প্রচণ্ড একটা থাবড়া মেরে আমাকে জাহাজের কাঠের মেঝের ওপর ফেলে দিল। কোনওরকমে ক্যামেরাটা বাঁচালাম বটে, তবে আমার আর ছবি তোলার অবস্থা থাকল না। দেওয়াল ধরে পা টিপে টিপে আমার কেবিন পর্যন্ত এসে দেখি জুতোর দোকানের সেই মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পার্কা-র পকেট থেকে চাবি বের করতেই মেয়েটি আমার অবস্থা দেখে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে দরজাটা গায়ের জোরে ঠেলে ধরে বলল, 'এই চিঠিটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো। তারপর চেঞ্জ করে লাইব্রেরিতে গিয়ে কফি আর চকোলেট খেয়ে শরীরের তাপ ফেরাও। সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলে নাকি!'

পার্কা খুলে রেখে মুখবন্ধ খামটা ছিঁড়ে দেখি রাজার দু-লাইন চিঠি বা আদেশনামা, নিজের হাতে ইংরিজিতে লিখেছেন। বাংলায় বললে দাঁড়ায়- তোমার কেবিনে ফিরে আসতে যতই দেরি হয়ে থাকুক, এখনই চলে এসো।

তার মানে রাজা আগেও আমার খোঁজ করেছেন, আমি যে কেবিনে নেই তা জেনেই এই চিরকুট পাঠিয়েছেন।

রাজার কেবিনের কাছে পৌঁছবার আগেই কিছুটা দূর থেকে চোখে পড়ল, দরজার সামনে থেকে বিরাট চেহারার দুটো লোক একটা কুকুরকে চেন ধরে টানতে টানতে নিমেষে উল্টো দিকে দৌড় লাগাল।





এবারও রাজা স্বয়ং দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু এবার আমাকে যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেটা অন্য একটা ঘর। প্রথমটার মতো এটাও একটা বড় বসবার ঘর। এ ঘরে মস্ত একটা টেবিলের ওপর পাতলা কাগজে আঁকা বিরাট একটা ম্যাপ খোলা আছে। ম্যাপের বাঁদিকে এবং নীচে দুর্বোধ্য অক্ষরে লাইনের পর লাইন কী সব লেখা। লেখাগুলো একটানা নয়, ছোট-বড় নানা ভাগে ভাগ করা।

তাঁর দরজার সামনে থেকে কুকুর নিয়ে লোক-দুটোর কথা শুনে রাজা কিছুমাত্র ব্যস্ত হলেন না, শুধু বললেন, দুজনই সোমালিয়ার মানুষ। শুনেছি একসময় জলদস্যু ছিল, এখন বোধ হয় সমুদ্রে ডাকাতির খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না, অন্য কোনও মতলবে আন্টার্কটিকা

চলেছে । ক্যাপ্টেন বললেন, ওদের একেকটা কুকুরের জন্য প্রচুর ডলার দিতে হয়েছে, তুমি যা দিয়েছ তার দ্বিগুণ ।

মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে রাজা একটা বরফের পাহাড়ের চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, 'এটা একটা হিমবাহ । এই হিমবাহের গভীরে লম্বা সুড়ঙ্গ আছে, প্রায় তিন কিলোমিটার । তার মধ্যে দিয়েও সমুদ্র বইছে । সুড়ঙ্গের পুবমুখ দিয়ে ঢুকে মাঝামাঝি এগোলে ডানহাতে সমুদ্রজল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে একটা গহ্বর আছে, সেখানে কী আছে জানো? মধ্যযুগের এক জলদস্যুর সারাজীবনের ধন-সম্পদ । কেউ সেখবর জানে না । হয়তো সোমালীয় দুজন ওই গহ্বরের সন্ধানেই চলেছে । এরকম সুড়ঙ্গওলা হিমবাহ এখানে অসংখ্য । যেমন সুন্দর তেমনই রহস্যময় ।'

'আপনি কি গুপ্তধনের টানে এতদূর এসেছেন?'

রাজা এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, 'নিজের রাজ্যের ধন-সম্পদ ফেলে এসেছি, এখন দস্যুর ধন-সম্পদ লুট করব? আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । পাবার আশা করি না, যদি পাই, তোমাকে বলেছি না- লোভ লালসা হানাহানির পৃথিবীতে আর ফিরব না ।'

রাজা ঠিক কী বলছেন, কী খুঁজছেন আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, 'ঠিক কী খুঁজছেন আপনি? জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদই বা কী? তা কি এই আন্টার্কটিকাতেই পাওয়া যায়?'

আবার তিনি ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে তর্জনী দিয়ে কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এর সবগুলোই একেকটা দ্বীপ । এই দ্বীপগুলো আসলে মাইলের পর মাইল লম্বা, কয়েকশো কিলোমিটার হওয়াও অসম্ভব নয়, চওড়াও তেমনই । এইসব দ্বীপের বিষয়ে এখনও প্রায় কিছুই জানা যায়নি । কিন্তু আমি জানি এইসব তুষারঢাকা দ্বীপে বিরাট বিরাট চোরা খাদ আছে, সেইসব গর্তের মুখ নরম তুষারে ঢাকা । সেটা আন্টার্কটিকার অনেক তুষারক্ষেত্রেই দেখা যায় । কিন্তু এই দ্বীপগুলোর একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য- এর ওপরের তুষারস্তরে খুব সূক্ষ্ম লক্ষ লক্ষ ছিদ্র আছে, প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য খেয়াল । এরকম একটা দ্বীপই আমি খুঁজছি । দ্বীপ না হয়ে তুষারক্ষেত্রও হতে পারে ।'

সংশয়ে আমার মন ছটফট করছে । সেটা না লুকিয়েই বললাম, 'যেসব দ্বীপের কথা কেউ জানে না সেগুলোর বিষয়ে আপনি জানলেন কী করে?'

দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাজা বললেন, 'আমার দেশে এক বৃদ্ধ ভূগোলবিদ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ আছেন, তিনি পৃথিবী সম্পর্কে এমন আশ্চর্য সব কথা বলে দিতে পারেন যে তুমি একবার শুনলে তাঁর মুখ থেকে খসা প্রত্যেকটি কথার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকবে ।'

এই সময় হঠাৎই জাহাজ বেশিরকম দুলতে লাগল । রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরের বাইরে এসে জাহাজের করিডরের দেওয়ালে সাঁটা ফাইবার গ্লাসের জানলা দিয়ে দেখলাম চারদিকে শুধু উত্তাল সমুদ্র । কোনদিকে কোথায় যাচ্ছি তার কোনও হদিশ নেই । জাহাজের ক্যাপ্টেন ও আমাদের এক্সপিডিশন লিডার জানিয়েছিলেন- আলেকজান্ডার দ্বীপের দিকে এগোবার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

কয়েকদিন আগেও ড্যাঙ্কো, নেকো হারবার, একদিন কুভেরভিল ও এইরকম আরও কয়েকটি দ্বীপে নেমেছি । সমুদ্রের বুকে জাহাজ দাঁড় করিয়ে জোডিয়াকে চড়ে ওইসব দ্বীপে কয়েকঘন্টা করে ঘুরেছি । ড্যাঙ্কো দ্বীপে একটা গোটা ক্যাসেটে শুধু হাজার হাজার পেঙ্গুইনের প্রায় যাবতীয় চালচলন তুলেছি । আর এখন এদিকে ঠিক কোথায় চলেছি!

জাহাজের দুলুনি বেড়েই চলেছে । মাইকে বারবার হোয়েলারের সতর্কবার্তা শোনা যাচ্ছে- সকলে যেন কেবিনে ফিরে যান । কেউ যেন কেবিনের বাইরে না থাকেন ।

হঠাৎ আমার পিছনেই কেবিনের লোহার ভারী দরজা খোলার আওয়াজে ঘাড় ফেরাতেই রাজা চোখের তীব্র ভাষায় আমাকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করে চাপা মেঘগর্জনে বললেন, ‘বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ কী বলেছেন জানো? বলেছেন, একদিন মানুষের সংখ্যা এতই বেড়ে যাবে যে পৃথিবীতে সবার আর জায়গা হবে না, অন্য গ্রহে বসবাসের কথা ভাবতে হবে । তারও আগে আমাদের এই পৃথিবী শুধু অসৎ, নির্দয়, লোভী, মিথ্যাচারী মানুষে ভরে যাবে, তখন খাঁটি মানুষ যাঁরা তাঁরা নিজেদের দেশ খুঁজে পাবে স্থলভূমির মানচিত্রের বাইরে মাটির নীচে কোনও অদৃশ্য অঞ্চলে ।’

তাঁর গলায় যেমন মেঘগর্জন, চোখেও তেমনই মেঘ ভেঙে ফেটে পড়া আলো । জাহাজ যে এত দুলছে, আমি যে প্রাণপণে মেঝেতে পা সেঁটে রেখে, দেওয়ালে ভর দিয়ে ছিটকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি, দৈববাণীর মতো রাজার আশ্চর্য কথাগুলো শুনতে শুনতে সেটা পর্যন্ত খেয়াল করিনি ।

এবারও সেই টেবিলজোড়া ম্যাপের ঘরে বসেছি । এর মধ্যেই সেই জুতোর দোকানের মেয়েটি কী করে এই স্যুইট পর্যন্ত এসে মুখবন্ধ পটে কফি দিয়ে গেছে সেদিকে মন দেবারও সুযোগ পাইনি ।

এবার একা হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল- আলেকজান্ডার আইল্যান্ডেও নামা যাবে না । কারণ হিসেবে বলা হল দ্বীপ আমাদের জাহাজ থেকে এখনও ১৬ নটিক্যাল মাইল দূরে (১ ‘নট’ মানে ১ ঘন্টায় ১.৮৫ কিলোমিটার গতিবেগ) । অর্থাৎ দ্বীপের কাছাকাছি জাহাজ নিয়ে যেতে আরও ১৬ ঘন্টা লাগবে । তাছাড়া এখানেও সেই প্রবল হাওয়া । ঘন্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে বইছে ।

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে নিজের কেবিনে ফিরে ক্যামেরাটা নিয়ে আরও বিপজ্জনক দুলুনির মধ্যে জাহাজের পিছনের খোলা জায়গাটায়

পৌঁছে মনে হল চোখের পলকে শরীরের সব তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে! হাওয়ার গতিও নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে, সমুদ্র জুড়ে শুধু ঝড়ের তাণ্ডব। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা মনে হয় ফেটে যাচ্ছে, ভয়াবহ হাওয়া যেন নাক-মুখ চেপে ধরেছে, নিঃশ্বাস নেওয়াই যাচ্ছে না। শরীর ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। অসাড় আঙুলেই পার্কা-র পকেট থেকে বের করে গোমুখের সাধুর দেওয়া ওষুধ তিন ফোঁটা জিভে ফেলতেই একটু যেন কাঁপুনি কমল।

হাতে-পায়ে জোর নেই। করিডরে ফেরার দরজাটা ঠেলে খুলতেও কয়েকবার চেষ্টা করতে হল। প্রতিবারের চেষ্টায় একটুখানি ফাঁক হয়েই আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে প্রায় ছিটকে এসে ভেতরে পড়লাম। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে শরীরের শক্তি কিছুটা ফিরে পেতেও অনেকটা সময় লেগে গেল।

আমরা কোনদিকে যাচ্ছি? কতদিন ধরে জাহাজ শুধু চলেছে তো চলেছেই। ছ-সপ্তাহের আর ক-সপ্তাহই বা বাকি আছে? জাহাজ কি তবে দিশাহারা?

মনের উদ্বেগ সত্ত্বেও যেই মনে পড়ছে আজ ১৪ ডিসেম্বর তখনই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। ১৯১১ সালে এই দিনটিতেই কুকুরে-টানা স্লেজগাড়িতে দক্ষিণমেরুতে পৌঁছেছিলেন রোয়াল্ড আমুন্ডসেন। যদিও এর বহু আগেই ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে রবার্ট স্কট, এডওয়ার্ড উইলসন আর আর্নেস্ট শ্যাকলটন ৮২ ডিগ্রি ১৬ মিনিট দক্ষিণ পর্যন্ত পৌঁছেও প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে আর সীমাহীন সাংঘাতিক তুষারে প্রায় অন্ধ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্যাকলটন অবশ্য এর ছ-বছর পরই ১৯০৮-এর ১লা জানুয়ারি দক্ষিণমেরুর ৯৭ মাইলের মধ্যে যেতে পেরেছিলেন। আর অ্যামুন্ডসেনের দক্ষিণমেরুতে প্রথম পদার্পণের মাত্র মাসদেড়েক আগেও স্কট তাঁর চার সহ-অভিযাত্রীর সঙ্গে সবার আগে দক্ষিণমেরু ছোঁয়ার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত রওনা হয়েও স্লেজ টানার কুকুরের অভাবে ব্যর্থ হন। কুকুর না পেয়ে তাঁরা নিজেরাই পালা করে স্লেজ টানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতেই লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। যখন পৌঁছলেন দেখলেন আমুন্ডসেন আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। স্কটের সঙ্গীরা কেউই আর ফিরে আসতে পারেননি। একটার পর একটা ভয়াবহ ঝড়ঝঞ্ঝায় পড়ে, অনাহারে, আত্মরক্ষার অব্যবস্থায় তিনিও পথেই মারা যান। তাঁর মৃতদেহের পাশেই তাঁর রোজকার অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ দিনপঞ্জিটি পাওয়া গেছে, দক্ষিণমেরু অভিযান ও সেই শ্বেতমহাদেশ বিষয়ে সে নাকি এক মূল্যবান ভাণ্ডার।

সেই ১৪ই ডিসেম্বর, সেই আন্টার্কটিকায় সেই দক্ষিণমেরু প্রদেশে আমি! ঠিক যে আমরা জাহাজের আশ্রয়ে আছি, জাহাজ যতটা এসেছে, কুমেরু বা দক্ষিণমেরু তার থেকে অনেক দূরে। হয়তো দেড়-দুহাজার কিলোমিটার দূরে, তবু তো দক্ষিণমেরুবৃত্তের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে গেছি। এই বৃত্তের ঠিক মধ্যবিন্দুই তো দক্ষিণমেরু।

ওদিকে দানব ঝড়ের হাড় হিম করা দাপাদাপি চলছে তো চলছেই।

এর মধ্যেই জাহাজে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল । পুরো জাহাজটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল । হয়তো দু-পাঁচশো ফুট দূরে ছিটকেও গেল ।

আসলে জাহাজ কখন সমুদ্র ফুঁড়ে ওঠা দুপাশের বিরাট বিরাট হিমবাহের মধ্যে দিয়ে একটা চ্যানেল ধরে চলতে শুরু করেছে আমি জানতাম না । যাত্রীদের কেউই হয়তো জানতেন না । এরকম একটা হিমবাহ হঠাৎই ভেঙে গিয়ে জাহাজ ঘেঁষে সমুদ্রে এসে পড়েছে । ভাঙা অংশটাই শোনা গেল পনেরো-কুড়ি মাইলের কম নয় ।

জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভাগ্যক্রমে জাহাজ বেঁচে গেলেও নেভিগেশন রুমের যন্ত্রপাতি ভালোই জখম হয়েছে । ঝড় তো নয়, মনে হয় লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেন হুংকার করে তেড়ে আসছে ।

হঠাৎ হোয়েলারের ঘোষণা- প্রত্যেকে লাইফ জ্যাকেট পরে রিসেপশনে চলে আসুন!

তবে কি সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে? বড় কোনও বিপদে পড়েছি আমরা? ঝড়ের হানায় বা ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ তার নির্দিষ্ট যাত্রাপথ থেকে অন্যদিকে সরে গেছে? জাহাজের বিভিন্ন কম্পাস রেডার ইত্যাদি কাজ করছে তো?



৬

রিসেপশনে অনেকেই পৌঁছে গেছেন । জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও সামুদ্রিক হাওয়া ও ঢেউ বিশেষজ্ঞকে পাশে নিয়ে হোয়েলার সবাইকে কী একটা বোঝাচ্ছেন । দেখলাম সকলেই বন্ধ দরজার স্বচ্ছ জানলার সামনে ভিড় করে বাইরে কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুযোগ পেয়ে আমি যা দেখলাম তাতে অজানা আশঙ্কায় দমবন্ধ হয়ে আসে । হিমবাহঘেরা চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন বিপদ! জানলা দিয়ে দেখলাম যেন একটা বিরাট বরফের দুর্গ ভেসে চলেছে । কুড়ি-পঁচিশতলা বাড়ির মতো উঁচু, লম্বায় অন্তত কয়েকশো কিলোমিটার । চওড়াও কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটারের কম নয় । বিশাল এই হিমশৈলের সামনে ও যে-পাশটা জাহাজের দিকে, সেই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দু-দিকই মস্তবড় একটা কফিন বা ডিভানের মতো মসৃণ, মাথাটাও কফিন বা ডিভানেরই মতো চাঁচাছোলা । যেন শ্বেতপাথরের একটা বিশাল চলমান উঁচু মাঠ । আমাদের পিছন থেকে এসে জাহাজটাকে দ্রুত অতিক্রম করে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে ।

জাহাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও রেডার দেখে যাঁরা কোনও দ্বীপের অস্তিত্ব আগাম টের পান তাঁদের একজন প্রায় দৌড়ে এসে হোয়েলারের হাতে একটা বড় কাগজ দিলেন । হোয়েলার তাতে চোখ বুলিয়ে দুয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখে নিয়ে বললেন, ‘এতক্ষণে আলেকজান্ডার আইল্যান্ড এসে যাবার কথা ছিল । অথচ জাহাজের রেডারে ওই দ্বীপটার কোনও চিহ্নই ধরা পড়ছে না । ক্যাপ্টেন জানাচ্ছেন যে-অফিসাররা রেডারে চোখ রেখে বসে আছেন, তাঁদের কাছে সবচেয়ে আগে যে দ্বীপের অস্তিত্ব ধরা পড়বে জাহাজ এবার সেখানেই থামানো হবে, সেই দ্বীপেই আমরা নামব ।’

ঝড় ও দুলুনির বিরাম নেই । বমি ধরার পলিথিন-প্যাকেট নিয়ে জাহাজের কেবিন-বয়দের ঘোরারও বিরতি নেই । কয়েকজন যাত্রী তখন-তখনই তার সদ্ব্যবহার করলেন, কেউ কেউ আবার আগাম সংগ্রহ করে রাখলেন । জাহাজ এত বেশি দুলছে যে কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব । ধরবার মতো দেওয়াল বা ধাতুর স্তম্ভ বা কাউন্টার না পেয়ে একজন আরেকজনকে ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে । তবে লাইফ জ্যাকেট কেন পরে আসতে বলা হয়েছিল বোঝা গেল না ।

উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে সেই রহস্যময় রাজাকে দেখতে পেলাম না ।

বিনা আহ্বানে তাঁর স্যুইটের দরজায় ঠকঠক করা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে মনে দ্বিধাসত্ত্বেও ডাইনে-বাঁয়ে দেওয়াল ধরে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে প্রায় কুস্তি লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্যুইটের সামনে এসে হাজির হলাম । লোহার ভারী দরজা, কড়া নেই, ঘন্টিও বাজছে কিনা বোঝা গেল না, অগত্যা হাতের মুঠো দিয়ে ঘা দিতে লাগলাম ।

দরজা খোলার কোনও লক্ষণ নেই । আমার মুঠোর ঘা হয়তো ভেতরে শোনাই যাচ্ছে না, অথবা রাজা নিদ্রিত, কিংবা স্নানঘরে ।

শরীর যখন ভেঙে পড়ে তখন মানুষের মস্তিষ্কও বোধহয় শিথিল হয়ে যায় । এতক্ষণ দুলুনির সঙ্গে লড়াইয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম, এখনই আবার একইভাবে এতটা পথ পার হয়ে নিজের কেবিনে ফেরার কথা ভাবতে পারছি না । অগত্যা আগুপিছু না ভেবে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম- ইয়োর এক্সসেলেন্সি! ইয়োর এক্সসেলেন্সি!

কোনও সাড়া নেই । অথচ দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না, দরজার সামনেই বসে পড়লাম ।

বেশ খানিকক্ষণ পর দরজা খুলে গেল । উঠে দাঁড়িয়ে দেখি রাজার চোখ যেন জ্বলছে । শুধু বললেন, 'ভেতরে এসো ।'

এবারও সেই যে-স্যুইটে ড্রয়িংরুমের বিরাট টেবিলে মানচিত্র মেলে রাখা আছে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন । সেখানে এবার নতুন যেটা দেখলাম তা হল তাঁর সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা একপাশে মেঝের কার্পেট সরিয়ে সরাসরি কাঠের ওপর বসানো । যন্ত্রটার বিভিন্ন মিটারে নানা আকারের কাঁটাগুলো ডাইনে-বাঁয়ে, ওপর-নীচে যেন ছটফট করছে । কখনও একটা, কখনও দুটো, কখনও অনেকগুলো একসঙ্গে, কখনও খুব দ্রুত, কখনও কিছুটা ধীরে ।

রাজা একবার কাঁটাগুলোর নড়াচড়া, একবার মানচিত্র গভীর দৃষ্টিতে দেখছেন । তাঁর ভ্রূ কোঁচকানো, কপালে গভীর ভাঁজ ।

মেঝের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো একটা মোড়ায় বসেও আমি ঠিকমতো টাল সামলাতে পারছি না, রাজা কী করে কখনও কোমর ভেঙে যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ছেন, কখনও সোজা হয়ে মানচিত্রে চোখ রাখছেন ভেবে পাই না । টেবিলটা মেঝের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো না হলে সেটা এতক্ষণ ভূতুড়ে টেবিলের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত বা দৈত্যনাচ শুরু করে দিত ।



রাজা হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'দ্বীপে নামবার সময় তুমি কী কী সঙ্গে নাও?'

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'ক্যামেরা, একটা এক্সট্রা ব্যাটারি, একটা খালি ক্যাসেট আর আমার পাসপোর্ট আর বিমানের টিকিট । আর মারাত্মক ঠান্ডায় রক্ত জমে গিয়ে যাতে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায় তার একটা প্রাকৃতিক ওষুধ, হিমালয়ের এক সাধু আমাকে দিয়েছিলেন ।'

রাজা এবার আমাকে নিয়ে পাশের স্যুইটে এলেন । হুবহু একইরকম বড় বসবার ঘর ।

আমি বললাম, 'আপনি কি রিসেপশনে গিয়েছিলেন? হোয়েলার জানালেন, আলেকজান্ডার দ্বীপের হদিশ রেডার থেকে হারিয়ে গেছে । এরপর রেডারে যে দ্বীপের অস্তিত্ব দেখা যাবে'-

রাজা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হোয়েলার আমাকে স্যুইটে ফোন করে সব বলেছেন । তিনি কি জানেন না যে আগামী দুদিনের মধ্যে কোনও দ্বীপের হদিশই জাহাজের রেডারে ধরা পড়বে না? তার প্রথম কারণ, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই পথে কোনও দ্বীপ পড়বে না, দ্বিতীয় কারণ রেডার এখনই ঠিকমতো কাজ করছে না । তাছাড়া, ভাঙা হিমবাহের ধাক্কায় নেভিগেশন অফিসাররাও হয়তো চৌম্বক দক্ষিণমেরুর নিত্যপরিবর্তমান অবস্থানের হিসেব করে কম্পাসের দিকনির্দেশ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারবেন না ।'

তিনি চুপ করে গেলেন । গভীরভাবে কিছু ভাবছেন । তাঁর চোখের তীব্র উজ্জ্বলতা আমার নজর এড়াল না ।

তিনি আবার শুরু করলেন, 'হাওয়ার ধাক্কায়, যান্ত্রিক গোলযোগে জাহাজ এখন কোনদিকে যায়, কোন দ্বীপে তুমি নামবে তা কেবল আমার দেশের ভূগোলবিদ গণিতদেবই বলতে পারেন । ইংরিজিতে 'গড অব ম্যাথমেটিক্স' এই প্রথম বললেন । কথাটা বলেই তিনি আমার মুখের ভাব যেন জরিপ করতে লাগলেন ।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ফেলো এক্সপিডিশনার্স!' আবার মাইকে হোয়েলার কিছু ঘোষণা করছেন, 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজ উনত্রিশ দিন হল আমরা সমুদ্রে রয়েছি, পূর্বনির্ধারিত যাত্রাসূচি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু করার কথা । কিন্তু তীব্র হাওয়া আর প্রবল ঢেউয়ের কারণে জাহাজ নির্ধারিত যাত্রাপথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে । একই কারণে এখনই ফেরার পথ ধরা সম্ভব হচ্ছে না ।'

মনে হয় যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া বা পুরো পরিস্থিতিটা বোঝবার জন্য একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করলেন- 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন! আপনারা ভীত হবেন না । আমরা আপনাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দুর্লভ অভিজ্ঞতার অংশীদার করে সম্পূর্ণ নিরাপদে উশুয়াইয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব । আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা জাহাজে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজে ও রেডিও অফিসাররা বাইরের জগতের সঙ্গে বার্তা-বিনিময়ে সদা নিয়োজিত । শুধু ছোট্ট একটা ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই । যেহেতু আমরা এই আশ্চর্য সুন্দর অভিযান নির্ধারিত ছ-সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে পারছি না, তাই সকলকে অনুরোধ কেউ কোনওরকম খাবার অপচয় করবেন না, আমাদের সকলকেই যতটা সম্ভব কম করে খেতে হবে । পানীয় জলের ব্যাপারেও একই অনুরোধ । প্লিজ, বেয়ার উইথ আস । দয়া করে এটুকু সহ্য করুন ।'



৭

পরদিন সকাল থেকে ঝড়ের দাপট কমতে লাগল, কিন্তু হিমশৈলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সেদিনই মাঝরাতে শুরু হল তুষারঝড়। কখনও বাড়ে, কখনও কিছুটা কমে।

সকালে, দুপুরে, রাতে খাবার ঘরে হইচই হাসি গল্প আর শোনাই যায় না। সকলেরই মনে উদ্বেগ, মুখে শঙ্কার ছায়া।

এরই মধ্যে হঠাৎ খাবার টেবিলেই মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে মেঝেয় একজন পড়ে গেলেন, তিনি এসেছেন জর্ডন থেকে। মুখ দেখেই চিনতে পারলাম, প্রথমদিন খাবার টেবিলে মজা করে বলেছিলেন- আমার দেশের ডেড সি-র নোনা জল চেখেছি, এবার চাখব আইসবার্গের মিঠে জল।

জাহাজের কর্মীরাই ধরাধরি করে তাঁকে তাঁর কেবিনে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। জাহাজের আইরিশ ডাক্তার ওষুধপত্রও দিলেন, সেইসঙ্গে বিধান দিলেন যে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে সবসময়ই শয্যাশায়ী থাকতে হবে।

এরও একদিন পর দূর থেকে খালি চোখেই ঝাপসামতো একটা বরফে ঢাকা দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপটার নাম কী, আমরা কত অক্ষাংশ, কত দ্রাঘিমাংশে আছি, এসব বিষয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন, এক্সপিডিশন লিডার, চিফ অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ার কেউই আমাদের কিছু ভেঙে বলছেন না। বরং মনে হয় সবাই কিছু একটা লুকোচ্ছেন।

কয়েক ঘন্টা পর জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল। আরও আধঘন্টা পর দ্বীপে যাবার জন্য সিঁড়ির মুখে পৌঁছবার ঠিক আগে দরজা-বন্ধ যে ঘরে নাম সই করতে হয় সেখানে সই করে কিউয়ে দাঁড়াতে বলা হল।

একটার ওপর একটা গলা অব্দি গরম পোশাক, পায়ে দু-প্রস্থ মোজা, হাতে দু-প্রস্থ দস্তানা, মুখ-মাথা ঢাকা টুপি পরে তৈরি হয়ে নাম লেখার ঘরে লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি সবার আগে রাজা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে সেই বড় ব্যাগটা। আমাকে দেখেই কাছে ডেকে নিলেন ও তাঁর পিছনের জাপানি ছেলেটাকে কী একটা বলে তার জায়গায় আমাকে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সিঁড়ির দরজা এখনও খোলেনি। রাজা গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, ‘আজ প্রথম জোডিয়াকটায় যেতে হবে, ফিরবও একেবারে শেষটায়। এই দ্বীপে যত বেশি সময় পাওয়া যায় ততই ভালো।’

একটু পরেই দরজার সামনে দাঁড়ানো কর্মীদুজন গায়ের জোরে ঠেলে ভারী দরজাটা খুলে ধরতেই আমরা দুজন বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালাম। আমাদের পিছনে পিছনে আরও চারজন বেরিয়ে এলেন। জাহাজের গায়ে লাগানো নড়বড়ে অস্থায়ী সিঁড়ি বেয়ে একে একে ছজনই নেমে এসে প্রথম জোডিয়াকটায় উঠে বসলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপের গায়ে লাগানো পাটাতনে যে দুজন কর্মী যাত্রীদের সব কিছু নিয়মমাফিক আছে কিনা দেখেন, রাজার বড় ব্যাগটা দেখে আজ আর কিছু বললেন না, শুধু সম্মতিসূচক মুচকি হাসলেন।

ঝাঁকুনি দিয়ে জোডিয়াক ছাড়তেই আমি ডানহাতের চামড়ার দস্তানা খুলে পার্কা-র ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বুকের কাছ থেকে ক্যামেরাটা বের করলাম। চামড়ার দস্তানায় হাত ঢাকা থাকলে জুম-ইন জুম-আউট করাই যায় না, ক্যামেরা অন-অফ করাও কঠিন।

দ্বীপ এখনও বেশ দূরে। লং শটে সমুদ্রের বুকে পুরো দ্বীপটা ধরব বলে ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে ছোট ছোট হিমশৈলের ধাক্কা সামলাচ্ছি, ডানহাতের পাতা ও পাঁচ আঙুল কেউ যেন পাথরছ্যাঁচা করছে।

রাজা চোখে দূরবিন লাগিয়ে হয়তো দ্বীপটাকেই দেখবার চেষ্টা করছেন।

আরও কিছুক্ষণ পর পুরো দ্বীপ আমার ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা দিল। ক্রমশ দ্বীপটা বড় হতে লাগল। সমুদ্র জুড়ে বিরাট একফালি বরফের মতো দেখাচ্ছে। দ্বীপটার নাম কী? জোডিয়াক-চালকও এ দ্বীপের নাম বলতে পারল না বা বলতে চাইল না।

জোডিয়াক থেকে যেখানে নামতে হল সেখানে জল এক ফুটের বেশি নয়। প্রত্যেকের পায়ে হাঁটু অব্দি রবারের জুতো, পা ভেজবার ভয় নেই। দ্বীপটাও জল থেকে বেশ উঁচু, ক্রমশ ঢালু হয়ে পাহাড়ের মতো আকার নিয়েছে। দ্বীপের বুকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে ছোট-বড় আরও অনেক তুষারের স্তূপ। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল যেন সাদা মেঘের পাল মর্ত্যে নেমে এসেছে।

কিছুটা কসরত করে দ্বীপের কিনার আঁকড়ে বরফের ওপর হাঁটুর ভর দিয়ে দ্বীপে উঠে গেলাম। রাজা জলে দাঁড়িয়েই এক হাতে হোয়েলারের বাড়ানো হাত ধরে বেশ সহজে উঠে এলেন।

'সবসময় আমাকে অনুসরণ করো' বলে তিনি হনহন করে দ্বীপের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্বীপটা মনে হয় খুবই বড়। মাঝে মাঝে তুষারের বুকে নীল জলের অপূর্ব সব হ্রদ। প্রত্যেকটা হ্রদের আকার ও আয়তন আলাদা। একটার সঙ্গে আরেকটার জলের গাঢ় নীল রং ছাড়া আর কোনও মিল নেই। প্রত্যেকটা হ্রদই এত সুন্দর যে ফেলে এগিয়ে যেতে কষ্ট হয়। তার চেয়েও কষ্ট- ছবি তুলতে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। কোথাও সময় নিয়ে ক্যামেরা প্যান করতে গেলে বা ঢালুর দিকে উঠে ক্যামেরার চলন ভাবতে চাইলে রাজা

পিছন ফিরে হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। এক জায়গায় হ্রদের বুক ফুঁড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে বৃত্তের আকারে জল তীব্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে অবিরাম নেমে যাচ্ছে দেখে ক্যামেরা ফুল জুম থেকে খুব ধীরে ধীরে জুম-আউট করতে খানিকটা সময় লেগে গেল। ক্যামেরা থেকে চোখ তুলতেই দেখি হ্রদের তীরে রাজা তাঁর সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি বসিয়ে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

হ্রদটা এতই বড় যে মনে হয় এই দ্বীপটা যেন একটামাত্র দ্বীপ নয়, হ্রদের দু-তীরে দুটো আলাদা দ্বীপ।

টলটলে নীল জলের ছোট-বড় হ্রদ এখানে অনেকগুলো, আমিই সতেরোটা গুনেছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি হ্রদগুলোর আলাদা আলাদা আকার দেখে। কোনওটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল, কোনওটা আবার বরফে বুক চেপে শুয়ে থাকা পেঙ্গুইনের মতো। ছোট্ট একটা হ্রদ দেখলাম, একেবারে পদ্মপাতার আকার। একটা হ্রদ দেখতে দেখতে পাড়ের নরম তুষারে আমার পা গেঁথে গেল- হুবহু মানুষের চোখের মতো গড়ন! নীল জলে টলটল করছে।

এরকম সাংঘাতিক শীতে, তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের এত নীচে সেখানে হ্রদের জল জমে বরফ না হয়ে কী করে এমন টলটল করছে সে-ও ভারি আশ্চর্যের। তিনটে হ্রদ ছুঁয়ে দেখেছি- জল ঠান্ডাও না, চমৎকার উষ্ণ। আরেকটা হ্রদ তো রীতিমতো গরম জলের, হ্রদের বুক থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে।

এখানে সাতদিন বা একমাস থেকে সারাদিন সারারাত ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে পারলে কী আশ্চর্য একটা প্রকৃতির রূপ দেশে ফিরে সবাইকে দেখাতে পারতাম! এটা ভেবেই এই ভয়ানক ঠান্ডার মধ্যেও মনে শিহরণ জাগে।

এই দ্বীপে আমাদের বরাদ্দ সময় তিনঘন্টা। এর আগে কোনও দ্বীপেই এরকম হ্রদও দেখিনি, এত দীর্ঘ সময়ও থাকতে দেওয়া হয়নি। হয়তো জাহাজে কিছু জটিল মেরামতির কাজ করা হচ্ছে।

হাতে এখনও দেড়ঘন্টা আছে। দেড়ঘন্টায় যতটুকু দেখেছি তাতেই বোঝা যায়, এর আগের দেখা সবচেয়ে বড় দ্বীপের চেয়েও এই দ্বীপটা বেশ কয়েক গুণ বড়।





রাজা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন, আমি সাবধানে তাঁর পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্তে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি যাতে নরম তুষারস্তরের নীচে কোনও চোরা খাদে পা পড়ে তলিয়ে না যাই । তার মধ্যেই কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলছি, যেখানে পারছি পকেট থেকে স্টিল ক্যামেরা বের করে দুয়েকটা স্থিরচিত্রও তুলে নিচ্ছি, হঠাৎই সহস্র দৈত্যের শিস শুনে চমকে গিয়ে দেখি বহুদূর থেকে কোটি কোটি টন সাদা গুঁড়ো প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে । কয়েক মুহূর্তেই সেই সাদা গুঁড়ো আমার জুতো, প্যান্ট, পার্কা, ক্যামেরা, কালো চশমার রং মুছে সব সাদা করে দিল । ঠান্ডাও আরও ভয়ানক হয়ে উঠল । আমি এরকম আকস্মিক আক্রমণে প্রথমটা একেবারে বোধ-বুদ্ধিহীন হয়ে পড়লাম । পরে যখন বুঝলাম যে এ সেই মারাত্মক তুষারঝড়, তখন ভয় এসে মনকে আচ্ছন্ন করল ।



৮

রাজা কোথায়, কতদূরে জানি না । তাঁর পায়ের চিহ্নও বরফে ঢেকে গেছে । আমাদের দলেরও কেউ এদিকে এত দূরে আসেনি । অসীম এই তুষাররাজ্যে আমি এখন একেবারে একা । যেখান থেকে দ্বীপে উঠেছি সেখানে ফিরে যাবার রাস্তাও যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে । অতিবেগুনি রশ্মি আটকানো চশমার কালো কাচ থেকে দস্তানা ঢাকা হাতে বহু কষ্টে যতবারই তুষার মুছে ফেলি, ততবারই আবার চশমা তুষারে ঢেকে যায় । এরই মধ্যে যতক্ষণ পারলাম, দুহাতে ক্যামেরা উঁচু করে তুষারের ঝাপটা বাঁচিয়ে লেন্স নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে ধরে যতটা পারলাম প্রবল তুষারঝড়ের কিছুটা তুলে নিলাম ।

এই ঠান্ডা, এই তুষারপ্রবাহ আর সহ্য হচ্ছে না ।

পৃথিবীর ঠিক কোথায় আছি জানি না, এই নিষ্ঠুর তুষাররাজ্যের সীমা কোথায় কোনদিকে সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই, দলের কেউ বা দলনেতা এসে আমাকে খুঁজে বের করবেন সে ভরসাও ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে । তুষারের চাদরে আমার সারা শরীর ঢেকে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তুষারস্রোতের মধ্যে তুষারমূর্তি হয়ে গেছি । রাজা যদি আমাকে দেখতে না পেয়ে এদিকে ফিরেও আসেন, আমাকে খুঁজে পাবেন কী করে!

তুষারঝড় বেড়েই চলেছে । এরকম চলতে থাকলে আমি তো তুষারে ঢাকা পড়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাব! বাঁচবার সব আশা তবে শেষ হয়ে আসছে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুগন্ধ নাকে এসে লাগল । ঝোড়ো হাওয়াই বয়ে এনেছে । গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে আমার বিস্ময়ের আর সীমা নেই । গন্ধ যত বাড়ছে ততই যেন আমার শীতের তীব্রতাও কম বোধ হচ্ছে । মনে হয় যেন মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসছি । গোমুখের সাধুর দেওয়া ওষুধটার কথাও আমার মনে পড়ে গেল । বহু কসরত করে পার্কা-র ভেতরের পকেট থেকে শিশিটা বের করে যতই জিবের ওপর ফোঁটা ফেলতে যাই, ঝড়ের হাওয়ায় তা উড়ে মুখের বাইরে গিয়ে পড়ে । শেষ পর্যন্ত তুষারপ্রবাহের দিকে পিছন ফিরে কোনওরকমে জিবে সরাসরি তিন ফোঁটা ওষুধ ফেলতে সক্ষম হলাম ।

সুগন্ধ আর এই সন্ন্যাসীর ওষুধ আমাকে এবার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে মনে হল ।

খালি চোখে রোদে বা তুষারের দিকে তাকানোর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আমি সানগ্লাস সরিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি চারদিক গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে । আর সেই ঝোড়ো সাদা শূন্যতা আমার সারা শরীরে অবিরাম ঝাপটা মেরে চলেছে ।

এভাবে খালি চোখে তাকিয়ে থাকা খুব কষ্টকর । সানগ্লাস মুছে নিয়ে চোখে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে যা দেখলাম তাতে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল । প্রবল তুষারঝড়ের মধ্যে টাল সামলাতে সামলাতে কে একজন এগিয়ে আসছে । প্রথমেই মনে হল রাজা নন তো? হায়, যতটুকু দেখা গেল, রাজা নন! তবে কি কোনও অলৌকিক কিছু, নাকি তুষারপ্রবাহের মধ্যে তুষারেরই ক্ষীণ একটা ছায়ামূর্তি?

দুচোখে অসহ্য তুষারঝাপটা সহ্য করেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশরীরী ছায়ামূর্তির রহস্য বোঝবার চেষ্টা করছি, এক মিনিটকেই মনে হচ্ছে একঘন্টা, এইভাবেই কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর রাজাকে হঠাৎ চিনতে পেরে প্রাণ ফিরে পেলাম । ঝড়ে বয়ে-আসা সুগন্ধ, হিমালয়ের ওষুধ আর হারানো রাজার দর্শন আমাকে এতক্ষণের সব ভয় থেকে মুক্ত করল । চোখে সানগ্লাস পরে আমিও এবার রাজার দিকে এগোতে লাগলাম ।

মুখোমুখি হতেই রাজা বললেন, ‘আমাদের ঝড়ের বিরুদ্ধে হাঁটতে হবে । আমার ঠিক পিছনেই এসো, ঝড়ের ঝাপটা থেকে কিছুটা অন্তত বাঁচবে । আমি তোমার জন্যই ফিরে এসেছি । কিন্তু আর দেরি করা যাবে না । আমাকে অনুসরণ করো ।’

কিছুক্ষণ পর রাজা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে পিছনের দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘এটা কোনও দ্বীপ নয়, এটা একটা বিরাট তুষারক্ষেত্র । এরই উপকূলে আমাদের নামানো হয়েছে । শেষদিকে রেডার ঠিকমতো কাজ করেনি, জাহাজও তাই দিশা হারিয়ে ফেলেছে । আমার মতো পিছন ফিরে হাঁটো, পরিশ্রম কম হবে, হাঁপিয়ে যাবে না ।’

এই আদেশ বা নির্দেশ তখন-তখনই না মেনে রাজার মুখোমুখি হাঁটতে হাঁটতে আমি বলে ফেললাম- ‘আপনি কি ঝড়ে একটা আশ্চর্য সুগন্ধ পেয়েছিলেন?’

‘তুমি পেয়েছিলে তো? ওই গন্ধের ওষধিগুণ টের পেয়েছ নিশ্চয়ই?’

এই সময় ঝড়ের গতি হঠাৎই কমে এল । বললাম, ‘আপনি কী করে জানলেন?’

‘আমিই ঝড়ের হাওয়ায় ওই সুগন্ধ পাঠিয়েছি । এ একটা ফুলের গন্ধ । পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলে এই গাছ হয় । আমার যখন আঠেরো বছর বয়স তখন একবার সে-দেশে গিয়েছিলাম, তখনই সাতটা চারা এনে আমার দেশের জঙ্গলে পুঁতেছিলাম, বেঁচেছে মাত্র একটা । আশ্চর্যের কথা, প্রতি দশ বছরে একবারই এ গাছে ফুল ফোটে, শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণিমার দিন । ফুল থাকে অমাবস্যা পর্যন্ত, পুরো পনেরোদিন । তারপর কিন্তু ফুল শুকোয় না, ঝরে যায় না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ।

‘দশ বছর পর পর ফেব্রুয়ারির ওই পনেরোদিন সেই জঙ্গলের ধারে আমি একটা অসুস্থ পশুদের মেলা বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি । ওই মেলায় যে-কোনও রুগণ বা মুমূর্ষু পশু এলে ফুলের গন্ধে সুস্থ হয়ে যায় । শুনলে তোমার মন আলোয় ভরে যাবে- আফ্রিকায় একবার জঙ্গলের গরিলাদের মধ্যে সাংঘাতিক মড়ক লেগেছিল । রোজই বেশ কয়েকটা

গরিলা মরে যায় । ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ণিমা লাগার আগে পর্যন্ত অনেক গরিলা মারা গেল, তারপর যেই ওই ফুল ফুটেছে আর একজন গরিলারও মৃত্যু হয়নি । ওই সময় গ্রামের মুমূর্ষু লোকেরাও সব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় । এমনকি লেপার্ডের থাবার ঘা খেয়েও ফিরে আসা একটা মারাত্মক জখম বড় ক্যারিবু হরিণ যেন জাদুবলে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ।'

'ওখানকার এক গ্রামের মোড়লের কাছে এই ঘটনা শুনে আমি সাতটা চারা নিয়ে আসি । দাম হিসেবে আমার কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু গ্রামের কেউই তা নিতে রাজি হল না । কেন জানো? অতিথিকে কিছু দান করে তার দাম নেওয়া তাদের কাছে অধর্ম ।'

'আপনি এখন সেই ফুল পেলেন কী করে, আপনি তো নভেম্বরে দেশ ছেড়েছেন?'

'অমাবস্যার রাতে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার আগে গাছ থেকে বোঁটাসুদ্ধু ফুল নিয়ে তক্ষুনি মুখবন্ধ শিশিতে রেখে দিলে গন্ধটা টাটকা ফুলের মতোই তীব্র থাকে । প্রয়োজনে শিশির মুখটা একটু ফাঁক করলেই ওই সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে যায় । তবে ফুল কিন্তু শুধু ওই অমাবস্যার রাতেই তুলতে হবে ।'

তুষারঝড় শান্ত হতে চারদিক আবার তুষারে ঝলমল করে উঠল ।

মাত্র এক-দেড়ঘন্টার তুষারঝড়ে পায়ের নীচে আরও অন্তত দু-ফুট উঁচু বরফ জমে গেছে । ফলে ঝড় থামলেও হাঁটা এখন বেশি কষ্টকর । যেখানেই পা ফেলি প্রায় উরু অব্দি তুষারে ডুবে যাচ্ছে । তাছাড়া কনকনে হাওয়ারও আর বিরাম নেই ।

রাজার পায়ের গর্তে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি । তিনি খুব দ্রুত হাঁটছেন, ফলে আমারও গতি কমাবার উপায় নেই ।

প্রায় আধঘন্টা পর তুষারের ওপর একটা লম্বা ছায়া চোখে পড়তে রাজা ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু বললেন, 'আমরা যন্ত্রটার কাছে এসে গেছি, আর পনেরো-কুড়ি মিনিটের পথ ।'

সামনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে ছোট্টমতো কী একটা তুষারের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে । ওটাই যদি তাঁর সেই যন্ত্র হয় তাহলে এতক্ষণের ঝড়েও তুষারে ঢাকা পড়ল না!



যেন আমার মনের কথা বুঝেই রাজা বললেন, ‘এস্কিমোরা তিমির চর্বির সঙ্গে নানা ধরনের বুনো ফলের বীজের তেল মিশিয়ে ছ-মাস ধরে এ যন্ত্রের গায়ে রোজ দুবেলা মাখায়, ফলে জল বা বরফ যন্ত্রটার গায়ে লাগে না। আমি তখন ওই পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তারই চিহ্ন হিসেবে যন্ত্রটা ওই ছুঁচলো বরফচুড়োয় পুঁতে রেখেছি।’ সূর্য এখন যতই পশ্চিমে হেলছে, ছায়াটাও লম্বা হয়ে যেন আমাদের পা ছুঁতে আসছে।

আমি তুষারের বুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া ছায়াসুদ্ধ ওই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটার ছবি নেবার জন্য ক্যামেরা বের করছি দেখে রাজা গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘না।’

এরপর চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ হেঁটে যন্ত্রের কাছে পৌঁছে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে ডানদিকে একটা অপরূপ নীল হ্রদে আমার চোখ আটকে গেল। বিশেষ করে তার আকার দেখে মন বিস্ময়ে ভরে যায়। হ্রদটা দূরে হলেও মনে হয় যেন কাছেই। এখান থেকে একটা ডানা-মেলা বিরাট স্কুবা পাখির মতো দেখাচ্ছে। যেন কোনও শিল্পী তুষার কেটে বের করেছে এই টলটলে নীল আকার।

এমনিতে স্কুবার রং ধূসর-কালো, কাক বা কোকিলের মতো সুন্দর কুচকুচে কালো নয়, বিশ্রী ময়লা-কালো, কোনও একটা দ্বীপে স্কুবা পাখিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রিল (চিংড়ি জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী) খেতেও দেখেছি, কিন্তু এখানে তুষারের বুকে স্বর্গীয় নীল রঙে গড়া স্কুবাকে যেন এক পক্ষীদেবতার মতো দেখাচ্ছে।

নানা আকারের এইসব বিস্ময়কর হ্রদ কি পুরোপুরি প্রাকৃতিক হ্রদ, নাকি এতে মানুষের হাতের ছোঁয়াও আছে? তা-ই বা কী করে সম্ভব? এই সীমাহীন তুষাররাজ্যে মানুষের বাস ছিল না তো কোনওদিন!

রাজাকে দেখলাম হ্রদের পাড় ঘেঁষে কাল্পনিক স্কুবার লেজের দিকে তাঁর যন্ত্রটি রেখে তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছেন । একবার দেখলাম যন্ত্রটার গায়ে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন ।

তাঁকে ও তাঁর যন্ত্রটাকে তাঁর নিষেধ মেনে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে রেখে হ্রদের এক পাশ ধরে ছবি তুলতে তুলতে তাঁর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম । রাজা হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার পায়ের চিহ্ন ধরে এসো ।' কথাটা বলেই সোজা পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগলেন ।

তুষার এখানে আরও নরম বা হয়তো তুষারঝড়েই এরকম হয়েছে । পুরু বরফে রাজার পা ঢুকে গিয়ে কোথাও কোথাও প্রায় হাঁটু-সমান গর্ত । আমাকে সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে । কোথাও কোথাও গর্ত থেকে পা টেনে তুলতে কষ্ট হয়, একবার তো টাল রাখতে না পেরে বরফের ওপর আছাড় খেলাম ।





আহত বাঁহাঁটু সামলে বেশ কসরত করতে হল । আর তখনই চোখে পড়ল, বহু দূরে, আকাশ যেখানে অসীম বরফপৃষ্ঠের ওপর নেমে এসেছে, সেইখান দিয়ে একদল কুকুর অনেকটা আমাদের সাইকেলরিকশার মতো একটা গাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে । এত দূর থেকে মনে হল কয়েকটা মেঠো ইঁদুর একটা বাক্স পিঠে নিয়ে দৌড়োচ্ছে । নিশ্চয়ই সেই সোমালীয় জলদস্যু দুটো । কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে তারা কোথায় যাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা রাজাকে ছাড়িয়ে চলে গেল । রাজা দেখতে পেয়েছেন কিনা বোঝা গেল না ।

তিনি সরলরেখার মতো সোজা গেলেও একটু পর-পরই একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যন্ত্রটা তুষারে রেখে তার ওপর ঝুঁকে কিছু শুনছেন বা শোনবার আশা করছেন । হঠাৎই কী একটা শুনে দূর দিগন্তে ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ করতে লাগল । আমি দূর থেকেই বুঝতে পারলাম, কুকুরে টানা গাড়ি তাঁরও এবার চোখে পড়েছে ।

এখানে এখন তাপমাত্রা কত কে জানে! মাইনাস ১০, ১৫ বা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও অবাক হব না । তার ওপর হঠাৎ হাওয়া দিলে আরও কমে যায় । মাঙ্কিক্যাপের নীচে প্রতি সেকেন্ডের গরম প্রশ্বাসটুকুই এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় একমাত্র আরাম ।

রাজার পায়ের গর্তে পা ফেলে ফেলে এগোনো মোটেই সহজ নয় । টাল সামলাতেও সময় লাগছে । এরই মধ্যে রাজা যে কখন আমার চোখ থেকে হারিয়ে গেছেন খেয়াল করিনি । তাঁর খাড়া যন্ত্রটাও দেখা যাচ্ছে না । এমনিতে আকাশ বাতাস তুষারভূমি এখানে এত স্বচ্ছ যে কয়েক মাইল দূরের মানুষও দেখা যায় । সান্ত্বনা এই যে তাঁর পায়ের ছাপ আগের মতো তুষারপ্রবাহে ঢেকে যায়নি ।

তাঁকে না দেখতে পাবার কারণ আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগল না । রাজা তুষারের ওপর হাঁটু গেড়ে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে বরফে কান পেতে কিছু যেন শুনছেন । তাঁর যন্ত্রটাও তাঁর কপালের কাছেই শোওয়ানো । সেইজন্যই দূর থেকে আমার কিছুই চোখে পড়েনি ।

আমি কাছে যেতেই রাজা প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সুগন্ধের শিশি বের করে নিজে নাকের কাছে নিয়ে গভীর তিনটে শ্বাস নিলেন । খুব জোরে হেঁটে এসে আমি হাঁপাচ্ছি দেখে এক টানে আমার নাক থেকে মাঙ্কি ক্যাপের ঢাকনা সরিয়ে শিশিটার ছিপি খুলে সামনে ধরলেন । আমিও তাঁর মতো তিনবার যতটা সম্ভব জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম ।

রাজা কী করে এতক্ষণ তুষারে শুয়ে ছিলেন ভেবে পেলাম না । তাঁর শিশির আশ্চর্য গন্ধ নিয়ে কয়েক মুহূর্তেই আমার হাঁপানি ঠিক হয়ে গেল, বুকভরে অক্সিজেন নিতে পারলাম । কৃতজ্ঞতায় সাধুর দেওয়া ওষুধটা রাজাকে দিতে চাইলে রাজা বললেন, ‘নো, থ্যাঙ্কস । আই ডোন্ট নিড এনি আদার মেডিসিন ।’ (না, ধন্যবাদ । আর কোনও ওষুধ আমার দরকার নেই ।)



রাজা বোধহয় আমার খিদের কষ্টও বুঝতে পেরেছেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ব্যাগ থেকে একটা পাতলা ফিনফিনে ছোট্ট বেতের বাক্স দিয়ে বললেন, ‘খিদেয় যখন খুব কষ্ট হবে তখন এই বাক্স থেকে একটা করে কাঠি নিয়ে মুখে দিও । চিবোবে না, অনেকক্ষণ ধরে চুষে-চুষে খাবে । এখনই একটা মুখে দাও ।’

বাক্সটা অদ্ভুত দেখতে । দেশলাই বাক্সের চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশি লম্বা । বেতের, না কাঠের, না পিচবোর্ডের, নাকি আর-কিছুর- বুঝতে পারলাম না, তবে খুব হালকা আর পাতলা । ভেতরে শুকনো গোটা-হলুদের মতো কিন্তু তার চেয়ে সরু কতগুলো কাঠি, প্রত্যেকটা কাঠি আবার অনেকগুলো আরও সরু সরু কাঠি পাকিয়ে তৈরি ।

মুখে দিতে দিতে রাজাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এগুলো কী?’

‘একশো আঠাশটি ফলের নির্যাস, তার মধ্যে একাশিটাই তোমাদের অচেনা, বুনো ফলও বলতে পারো । এককেটা কাঠিতে প্রচুর ক্যালরি, তাছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকারি সবরকম ভিটামিন আর মিনারেল । সেইসঙ্গে একরকম কীটের লালা আর কোটি কোটি বছরের প্রাচীন পাহাড়ের পাথর থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি ওষুধের হাজার শক্তিও এর মধ্যে দেওয়া আছে । যতক্ষণ মুখে থাকবে এই শুষ্ক কাঠি তোমাকে তৃষ্ণার জলও জোগাবে ।’

আমরা যে এতক্ষণ একটা বিরাট ফাটলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি লক্ষ করিনি । খুব বেশি হলে আধ মাইলের মধ্যে এত বড় একটা ফাটল হাঁ করে আছে- নিশ্চয়ই রাজার চোখ এড়ায়নি ।

ফাটলের ওপারে বহুদূর পর্যন্ত অনেকগুলো ছোট-বড় বরফের পাহাড় ।

ফাটলের দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে রাজা বললেন, ‘সামনের ওই ফাটলের কিনার ধরে আমি প্রথমে ডাইনে হাঁটব । কতক্ষণ, জানি না । যদি আর ফিরে না আসি তাহলে আমি যে পথে যাব তুমিও সেই পথে চলে আসবে, আমার পায়ের চিহ্ন ধরে । আমার জন্য তোমাকে এক-দুঘন্টা বা হয়তো তিন ঘন্টাও অপেক্ষা করতে হবে । যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে আবার যেতে হবে ফাটলের ধার বরাবর বাঁদিকে । তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ।’

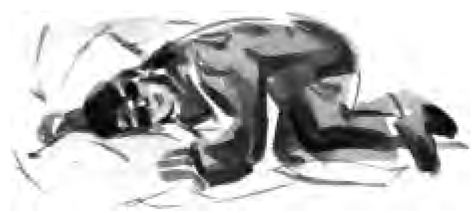
ফাটলের সামনে এসে বিস্ময়ে বোবা হয়ে বোধহয় শ্বাস নিতেও ভুলে গেছি- বিরাট ফাটলের ভেতরে তীব্র নীল আলো! এ কী করে সম্ভব?

রাজা সেই নীল আলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু না বলে তার যন্ত্র নিয়ে চলে গেলেন ।

এই নীল আলো বা তীব্র নীলের আভা আসছে কোথা থেকে! ফাটলের মধ্যে ঝুঁকেও আরও ঘন নীল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না । দেড়-দুসপ্তাহ আগেই কবে যেন একদিন সিয়েরভাকোভে হিমশৈলের খাঁজেও নীল রং দেখেছিলাম, তা ছিল অনেক হালকা আর বেশিরভাগই খুব ছোট আকারের । জাহাজের হিমবাহ ও হিমশৈল বিশেষজ্ঞ মিঃ কাহান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন- এই নীল রং আসলে হিমশৈলের ভেতর থেকেই আসছে । যে হিমশৈল যত পুরনো তার রং তত নীল । কেননা বরফ যত জমাট বাঁধে ততই বরফের

ভেতরের বায়ু বেরিয়ে যায়, আর সেই শক্ত জমাট হিমশৈল সূর্যের সব রং শুষে নিয়ে শুধু তীব্র নীল রং বিচ্ছুরণ করে ।

কিন্তু এই ফাটলের নীল আলোর কী ব্যাখ্যা? এটা তো নিশ্চয়ই কোনও দ্বীপ বা উপসাগরের কূল-ঘেঁষা কোনও হিমশৈল নয়, এই নীল আলোও পর্বতাকার হিমশৈলের পেট বা বুকের খাঁজ থেকে বেরচ্ছে না, আসছে আমার পায়ের সমতলে সীমাহীন তুষারক্ষেত্রের সুদীর্ঘ ফাটল থেকে ।



৯

এক কোটি তিরিশ লক্ষেরও বেশি বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই বরফমোড়া শীতলতম মহাদেশ আন্টার্কটিকার কোথায় আমরা এসে পৌঁছেছি, কুমেরুবৃত্তের কতটা ভেতরে চলে এসেছি, ঠিক কত ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে আছি, তার কোনও ধারণাই করা যাচ্ছে না । বেশ কয়েকদিন আগে রাজা একবার তাঁর সঙ্গের ম্যাপ দেখে কী-সব হিসেব করে জানিয়েছিলেন আমরা ৬৭ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের চেয়েও বেশ কিছুটা দক্ষিণে এসেছি ।

এখান থেকে জাহাজের কাছে ফিরব কী করে, যদি জাহাজের দেখা না পাই তাহলে ভারতে ফেরার কী উপায় হবে, এরকম প্রাণান্তকর ঠান্ডায় আর কতক্ষণই বা অনাহারে থাকতে পারব, এইসব ভেবে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অস্থির মনে বরফের ওপর বসে বসে রাজার অপেক্ষা করছি, হঠাৎই দূর থেকে যেন হাজার হাজার পেঙ্গুইনের ডাক ভেসে এল । যেখানে কোনও দ্বীপ বা সৈকত নেই সেখানে এই নিঃসীম তুষারক্ষেত্রে পেঙ্গুইন আসবে কোথা থেকে! তবে কি দূরে কোথাও সমুদ্র আছে? বা হয়তো কাছেই আছে- বরফের পুরু চাদরে ঢাকা? পেঙ্গুইনের ডাক শুনে সমুদ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস ক্রমশ যেন দৃঢ় হচ্ছে । কাছেই হোক দূরেই হোক, বরফে ঢাকাই হোক, বরফগলাই হোক, সত্যিই সমুদ্র থাকলে অন্তত উদ্ধারের একটা আশা থাকবে । একদিনে হোক, দু-দিনে হোক, সমুদ্রোপকূলে একবার পৌঁছতে পারলে কোনও না কোনও জাহাজের জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে পারব । তবে এই যে প্রায় দু-সপ্তাহ বা হয়তো তারও বেশি সমুদ্রে ছিলাম, তার মধ্যে আমাদের জাহাজ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও জাহাজ কোথাও দেখা যায়নি ।

পেঙ্গুইনের ক্ষীণ চেঁচামেচি এখনও শোনা যাচ্ছে ।

রাজা যদি আর ফিরে না আসেন, তাহলে এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক তুষারের বুকে তাঁর পায়ের চিহ্নই বা কতক্ষণ দেখা যাবে- এই ভয়ানক দুশ্চিন্তা থেকে সম্ভব-অসম্ভব নানা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল । সাপের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের মধ্যেও মানুষের মন যেমন ভয়ে কুঁকড়ে থাকে আমার অবস্থাও সেইরকম ।

অসহ্য ঠান্ডা । কিছু না খেলেও নয়, তার মধ্যে এই অন্ধকার ভবিষ্যৎ, এতরকম যন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা- আকাশের আলো কখনও পুরো মুছে যাবে না । বছরের এই সময়টা রাত এখানে মাত্রই দুয়েক ঘন্টার, তখনও পুরো অন্ধকার হয় না, অনেকটা গোধূলির মতো রং হয় আকাশের ।

ভেতরে কয়েকপ্রস্থ গরমের পোশাক সত্ত্বেও বরফের ওপর বেশিক্ষণ বসে থাকা অসম্ভব। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে থাকি। এ যেন বরফের পাহাড়ের জঙ্গল।

অন্যমনস্কভাবে কখন যেন রাজার পায়ের চিহ্ন ধরে এগোতে আরম্ভ করেছি। এক ঘন্টা বা হয়তো তার বেশি হাঁটছি, ছড়িয়ে থাকা বরফের পাহাড়গুলোয় দিনের বা সন্ধের বা ভোরের আলো পড়ে মনে হচ্ছে এ যেন কোনও কল্পজগতের দৃশ্য দেখছি।

রাজা যদি ফিরেও আসেন, এ পথেই আসবেন। আমিও তাঁর পায়ের ছাপ ধরে ধরে এগোচ্ছি। ফলে তাঁর নির্দেশ অমান্য করা হয়নি। তবে রাজা ফিরলে এরপর বাঁদিক ধরে এগোবেন, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে এখন যে পথে হাঁটছি, সেই পথেই আবার ফিরতে হবে। মনে হয় এই বাড়তি হাঁটার পরিশ্রম থেকে বাঁচাতেই আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গিয়েছিলেন।

সময় জানবার উপায় নেই। হাতে ঘড়ি থাকলেও দুপ্রস্থ দস্তানা ও পার্কা-র হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখা অসম্ভব, ঘড়ি তাই জাহাজেই পড়ে থাকে। হয়তো তিন-চার ঘন্টা ধরে হাঁটছি, দূরে আকাশছোঁয়া বিরাট একটা তুষারপাহাড়- ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তৃত সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণি।

এটা কি বরফে ঢাকা পাহাড়, নাকি হিমবাহ? নাকি বিরাট কোনও হিমশৈল? যদি হিমবাহ বা হিমশৈল হয় তাহলে তার পিছনেই সমুদ্রও থাকবে। কিন্তু তা-ই বা কী করে হবে? যতদূর শুনেছিলাম, আন্টার্কটিকা মহাদেশের চারপাশে সমুদ্রের বুকে যেসব দ্বীপ আছে, আমাদের জাহাজ প্রধানত সেইসব দ্বীপের কাছেই নোঙর ফেলবে। এভাবেই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে যতটা সম্ভব মেরুবৃত্তের ভেতরে যাওয়া হবে।

আন্টার্কটিকায় একেকটা হিমবাহ দু-চারশো কিলোমিটার দীর্ঘ হয় বলে শুনেছি, সামনের ওই বরফপ্রাচীরও তেমনই খুবই দীর্ঘ। যতটা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের একেবারে বাঁদিকের অংশে মস্ত একটা তোরণ বা খিলান। তেমনই সুন্দর এর স্থাপত্য। মনে হয় খুব বড় কোনও স্থপতি এসে জমাট বরফ কেটে তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তোরণের কাছে এসে দেখি এখানেও ফাটলের মতো নীল আলো।

পাহাড়, হিমবাহ বা তুষারক্ষেত্রের উঁচু ঢাল যা-ই হোক না কেন, এখানে এমন নীলাভ আলো আসছে কোত্থেকে!

খিদে, শীত, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রহস্যময় নীল আলোর উৎস নিয়ে ভাবতে ভাবতে সামনেই রাজাকে দেখে সাহস ফিরে পেলাম।

তোরণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে রাজা বললেন, 'চলে এসো। ভেতরে কিছুটা এগিয়ে ওপরের দিকে যাবার সিঁড়িমতো আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে অন্যদিকের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নীচে নামতে হবে।'

তোরণ দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল এটা একটা সুড়ঙ্গ, এ-মুখটা যেমন তোরণের আকারে খোলা, অন্যদিকের মুখও তেমনই খোলা থাকবে। ভেতরে ঢুকে দেখি সুড়ঙ্গ নয়, সুদীর্ঘ একটা গুহা, চওড়াও অনেকখানি। ওপরে ওঠার জন্যও ঠিক সিঁড়ি না, পুরো গুহাপথটাই ক্রমশ ঢালু হয়ে উঠে গেছে।

রাজাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। পায়ের তলায় এখানেও বরফ, কিন্তু হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, বাইরের ভয়াবহ ঠান্ডার তুলনায় গুহার ভেতরটা রীতিমতো উষ্ণ। এই আরামটুকু বেঁচে থাকবার জন্য দরকার ছিল।

গুহা ক্রমেই ঢালু হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। আন্টার্কটিকায় যে হিমসোপানের কথা শুনেছি এ নিশ্চয়ই তা নয়, সবচেয়ে উঁচু অংশটাও এখান থেকে বহুদূরে, পাঁচ-সাত কিলোমিটার বা তার বেশিও হতে পারে। অনেকটা ছবিতে দেখা জাপানের মাউন্ট ফুজি বা টেনেরিফ দ্বীপের তেইদে পাহাড়চুড়োর মতো পাদমূল থেকে চূড়া পর্যন্ত পুরো দূরত্বটাই ঢালু হয়ে ওপরদিকে উঠে গেছে।

সেই উঁচু অংশেও তীব্র নীলাভ আলো, এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। আরও উঁচুতে গুহার ছাদেও এমনভাবে নীল আভা ছড়িয়ে আছে যে ভুল করে প্রথমেই মনে হয় গুহার ছাদ নয়, নীল আকাশ দেখছি।

রাজার নির্দেশে কিছুটা ঝুঁকে হেঁটে আমরা ক্রমশ ঢালের মাথায় এসে পৌঁছলাম। এটাও একটা খুব বড় জায়গা, সমতল একটা চত্বরের মতো।

এখানেও রাজা তাঁর যন্ত্রটি বসিয়ে তার বিভিন্ন মিটারে চোখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলেন। তারপর একসময় যন্ত্রটি তুলে নিয়ে 'এসো' বলে খানিকটা সোজা গিয়ে তারপর ডানদিক ধরে ঢালের অন্যদিকে নামতে লাগলেন।

আমরা অনেকটা নীচে পৌঁছতেই সুদীর্ঘ এই তুষারগুহা আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। গুহার মধ্যেই একটু পর-পর আরও অনেক ছোট-বড় গুহা। সবসময়ই বাঁদিকের দেওয়ালে। প্রত্যেক গুহামুখ নীল আলোর আভায় ঢাকা। আরও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, এইসব গুহামুখের কাছাকাছি এলে চোখে না দেখেও বোঝা যায় সামনেই গুহা। তার কারণ গুহামুখ থেকে একটা অদ্ভুত উষ্ণ হাওয়া বেরিয়ে এসে কাছাকাছি জায়গাটাকেও উষ্ণতায় ভরিয়ে রেখেছে।



রাজা প্রত্যেক গুহার ভেতরে ঢুকে তাঁর যন্ত্র দিয়ে কী-সব পরীক্ষা করে চলেছেন। কোথাও কোথাও বরফের ওপর শুয়ে পড়ে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন। ভেতরের নীল আলোয় রাজাকে এরকম অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু এবার এখানকার একটা গুহায় যন্ত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে থাকা দেখতে দেখতে হঠাৎই আমার মনে হল এই মানুষটিকে আমি যেন এই প্রথম দেখছি, অদ্ভুত তাঁর মুখের চেহারা!

একটা গুহায় ঢুকে রাজা আর বেরলেন না। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। শীতের কষ্ট না থাকলেও খিদের কষ্টে কাহিল। তার মধ্যেই ক্যামেরায় অকল্পনীয় সব দৃশ্য তুলে নিচ্ছি।

একদিকে প্রচণ্ড খিদের কষ্ট, আরেকদিকে তুষারগুহার অপরূপ রূপ, একদিকে মৃত্যুর ছায়া, আরেকদিকে জীবনের আলো- এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটতে লাগল রাজার অপেক্ষায়।

এতক্ষণে রাজার দেওয়া কাঠির কথা আমার মনে পড়ল। ছোট্ট বাক্সটা থেকে একটা পাকানো কাঠি নিয়ে মুখে দিলাম।

খিদে-তেষ্টায় কাহিল অবস্থাটা সত্যিই কেটে যেতে লাগল। এবার আমিও গুহায় ঢুকে নীল আলোর মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। হঠাৎই সেই আশ্চর্য সুগন্ধ নাকে এসে লাগল। তার মানে রাজা এই গুহার মধ্যেই আছেন। সামনেই কোথাও তাঁর দেখা পাব। এতক্ষণের নিরাশা ও দুশ্চিন্তা আমার দূর হল। ওষধি গন্ধে শরীরের অবশ-অসাড় ভাবটাও আস্তে আস্তে কেটে গেল।

গন্ধের উৎসের কাছে পৌঁছে দেখি রাজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা যেন পাথর কেটে কোনও শিল্পীর হাতে গড়া, গভীর দৃষ্টিতে যেন বহুদূরের কিছু দেখছেন। তাঁর যন্ত্রটা

তাঁর কাছেই বরফের ওপর দাঁড় করানো ।

সত্যিই যেন খুব দূরের কিছু থেকে চোখ সরিয়ে আনলেন । আমার দিকেও বেশ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পর হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন । আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে খুব শান্ত স্বরে বললেন, ‘চোখ বোজো । শুনতে পাচ্ছ?’

মনে হল বহুদূর থেকে টুংটাং বাজনার মতো খুব মৃদু একটা সুরেলা ধ্বনি ভেসে আসছে । রাজা ফিসফিস করে প্রায় নিঃশব্দে বললেন, ‘বোধহয় কোনও দূর জগতের অধিবাসীদের সংগীত । এটা তাদের ভাষা হলেও হতে পারে ।’

তারপর নিজেই আবার কান পেতে সেই সংগীত বা সংগীতের মতো ভাষা শুনতে লাগলেন । শুনতে শুনতেই আমাকে বললেন, ‘শুয়ে পড়ে বরফে কান রাখো, হয়তো বরফের অনেক নীচে এই সংগীতের উৎস ।’ রাজার নির্দেশ মানতেই বরফে মিনিটকয়েক শুয়ে কান চেপে সত্যিই আরও স্পষ্ট সংগীতের আওয়াজ পেলাম ।

অনেকক্ষণ একই জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে সেই ভৌতিক সুর বা অলৌকিক সংগীত শোনবার পর লক্ষ করলাম, এই গুহামুখের বিপরীত দিক থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে ।

রাজা একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হয় যেন ধ্যান করছেন । ধীর স্বরে বললেন, ‘দূর থেকে ওই সংগীত শুনেই এতদূর এসেছি । এবার আরও এগোতে হবে । তুমি এখানেই অপেক্ষা করো । আমি আগে এই অভিনব গুহার গতিপ্রকৃতি বুঝে আসি । গুহার রহস্য আমাদের ভেদ করতেই হবে ।’ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে এবার অনেকটা যেন নিজের মনেই বললেন, ‘এই নীল আলো, এমন অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ কোথা থেকে কীভাবে আসছে!’

১০

সুদীর্ঘ বিরাট গুহাটার ভেতরে যেমন, এই গুহাতেও তেমনই, যতদূর চোখ যায়, নীল আলো । বড় গুহার চেয়ে এ-গুহার ভেতরটাও আরও বেশি উষ্ণ । তবে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাওয়া উচিত কিনা জানি না । কোথাও কোনও বিপদ লুকিয়ে আছে কি না, কে বলবে! রাজার আদেশ মেনে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই ।

গুহার বাইরে এতক্ষণে বোধহয় অল্প সময়ের জন্য সূর্য অস্ত গিয়ে আবার উদিত হচ্ছে ।

রহস্যময় সংগীতের রোমাঞ্চকর আকর্ষণে আমিই সামনের দিকে এগোতে লাগলাম । সামনেই বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে নীল আলো হঠাৎ যেন ঢেউ তুলতে লাগল । কাছে গিয়ে দেখি, সামনে, অল্পদূরে নিখুঁত চৌকো করে কাটা বড় বড় বরফের চাঁই একটার সঙ্গে একটা অদ্ভুতভাবে জোড়া লাগানো । অনেকটা আমাদের দেশের রাজমিস্ত্রির ইট বা পাথরখণ্ডের গাঁথনির মতো । একেকটা বরফের চাঁই ওপরে-নীচে ও পাশাপাশি দশ-পনেরো ফুটের কম না । সামনে থেকে পিছন অব্দিও সমান মাপের । একেকটা চাঁইয়ের মোট আয়তন অন্তত ১,২২৮ ঘন ফুট, হয়তো আরও বেশি । প্রত্যেকটা জোড় থেকে তীব্র নীলাভ আলো বেরিয়ে অবিরাম নীল ঢেউ সৃষ্টি করে চলেছে ।

নীলাভ বরফের ওপর লাল রক্ত দেখে আমার হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে উঠে এল । রক্তের পাশেই রাজা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন । কাছে গিয়ে দেখি রাজার নিশ্বাস পড়ছে, কিন্তু শরীরে কোনও সাড় নেই । দেহটা চিৎ করে বরফের ওপর জমাট বাঁধা রক্তের উৎসও স্পষ্ট হল । নাক ও ঠোঁটের কোনা দিয়ে বেরিয়ে চিবুক গলা বেয়ে রক্তের ধারো অনেকটাই শুকিয়ে গেলেও তখনও ক্ষীণ ভাবে বয়ে চলেছে ।

ভয়ানক বিপদে সম্পূর্ণ সহায়হীন অবস্থায়, প্রাণপণে চিৎকার করেও যখন কোথাও কোনও সাহায্যের কোনওই সম্ভাবনা নেই, মানুষের মন তখন কী ভাবে কী করবে আগে থেকে কারওই জানা থাকে না । আমি তাঁরই পার্কার পকেট থেকে সঞ্জীবনী সুগন্ধির শিশি বের করে ছিপি খুলে তাঁর নাকের কাছে ধরে রইলাম । ঠোঁট ফাঁক করে গোমুখের সাধুর ওষুধটাও ছ-সাত ফোঁটা জিভে ফেললাম ।

এভাবেই নাকে ও ঠোঁটে বার কতক ওষুধ দেবার পর রাজা একসময় চোখ মেললেন । তারপর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমার সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন । আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়ে ধীর স্বরে বললেন, ‘তুমি যে আমাকে খুঁজে পেলে সেটা আমার জীবনের

একটা খুব বড় পাওয়া ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন, 'জাহাজে দেখে সন্দেহ হয়েছিল, এত দূরে চলে আসবে ভাবিনি । আমার যন্ত্রটাও শুধু নয়, এই অসীম তুষারক্ষেত্রের ম্যাপটাও নিয়ে গেছে ।'

সুরেলা বাজনা এবার আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে । মনে হয় দূরে কোথাও অনেকগুলো ঝাড়বাতির টুংটাং আওয়াজ আশ্চর্য সুরে বেজে চলেছে । আওয়াজটা ভারি মধুর, সেই আওয়াজের বুনুনিতে যে সুর সৃষ্টি হচ্ছে তা মনকে অদ্ভুত আবেশে আচ্ছন্ন করে দেয় । ব্যাটারি হয়তো আরও পনেরো-কুড়ি সেকেন্ড চলবে, ক্যাসেটও আরও তিন মিনিট আছেই, তাছাড়া এই প্রথম এই অলৌকিক সংগীত এত স্পষ্ট শুনছি যে আমার সামান্য হাত-ক্যামেরায়ও রেকর্ড করা যায়, তা সত্ত্বেও ক্যামেরা চালাবার উৎসাহই পেলাম না । সব এক্সপোজড ক্যাসেটই জাহাজে রয়ে গেছে! জাহাজ থেকে দ্বীপে নামবার সময় প্রতিবারের মতো কেবিনেই রেখে এসেছি । একটা ফুল চার্জ করা সাত ঘন্টার ব্যাটারিও কেবিনে রয়ে গেছে! সর্বনাশ, এরপর তাহলে আর ছবি তোলাই যাবে না! যখনই মনে পড়ে, তখনই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে । আন্টার্কটিকার রোমাঞ্চকর সব দৃশ্যভরা পুরো সাতটা ক্যাসেট জাহাজে রয়ে গেল!

রাজা আরেকটু সুস্থ হলে যন্ত্র ছাড়াই আমাদের গুহা অভিযান আবার শুরু হল । ভোরের দিকে এক জায়গায় রাজা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা!'

ভীষণ চমকে গিয়ে দেখি রাজা মাথার ওপর দুহাত ছড়িয়ে অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচাচ্ছেন । গুহার মধ্যে তাঁর ওই উচ্চস্বর গমগম করতে লাগল ।

কাছে যেতেই রাজা দুহাতের তালু দিয়ে বিশেষ একটা বরফের চাঁই ঠেলতেই সেই চৌকো বরফ ছ-সাত ফুট পিছনে সরে গেল । আমাদের সামনেই তখন একটা চৌকো কুলুঙ্গির মতো খাঁজ তৈরি হয়েছে । রাজা সন্তর্পণে সেই কুলুঙ্গির মতো ফাঁকা জায়গাটায় উঠে পড়লেন । আমাকেও হাত ধরে টেনে তুললেন ।

এ যেন একটা বরফের ঘর- পাথরে তৈরি ঘরের মতোই, শুধু পাথরের জায়গায় জমাট বরফের চাঁই । গুহার মধ্যে শীতের যন্ত্রণাদায়ক কামড় এমনিতেই অনেকটা নিস্তেজ, এই বরফের চৌখুপিতে সেই তাপমাত্রা রীতিমতো আরামদায়ক । মাথার মাঙ্কি ক্যাপ ও হাতের চামড়ার দস্তানা খুলে পার্কা-র পকেটে তো ঢোকাতেই হল, পার্কা-র জিপারও গলার কাছ থেকে অনেকটাই খুলে ফেললাম ।



বরফের চৌখুপিতে উঠে আসবার পর থেকেই শরীরে খুব মৃদু একটা দুলুনি টের পাচ্ছি। পুরো গুহাটা অথবা হয়তো এই বরফপ্রাচীর বা এই চৌখুপিতে আমাদের পায়ের তলার বরফের চাঁইটা খুব ধীরে ধীরে কি আমাদের বাঁদিক থেকে ডানদিকে এগিয়ে যাচ্ছে- অনেকটা যেন হিমশৈলের মতো, তবে প্রায় অদৃশ্য গতিতে, শুধু অনুভব করা যায়! মৃদু ভূমিকম্পে যেমন মাথাটা প্রায় অজ্ঞাতে দুলে ওঠে, আমার সেইরকমের অনুভূতি হচ্ছে। এই পাহাড়, এই বড় গুহা, এই গুহার মধ্যে শাখাগুহা- এ-সবই একটা বিরাট হিমশৈল নয় তো? নাকি এক বিশাল হিমবাহ? বিপুলায়তন অস্থির কোনও বরফখণ্ড হওয়াও কি সম্ভব?

রাজার দুই চোখ এখানেও যেন কোনও কিছুর ধ্যান করছে। ওই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি একইভাবে সামনের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী সুরেলা ধ্বনি! কী আশ্চর্য সংগীত! মন দিয়ে শোনো। যেন নতুন কোনও কথা বলছে।'

হঠাৎই ওই অপরূপ সংগীত আগের চেয়ে জোরালো হয়ে উঠল! আরও অবাক ব্যাপার, পায়ের তলার বরফের চৌকো খণ্ডটা তার বাঁদিকে সাঁটা বরফখণ্ড থেকে অন্তত দু-ইঞ্চি সরে এসেছে! দুই বরফখণ্ডের জোড়ার দাগ থেকে যে নীল আলো বেরচ্ছিল সেটাও এখন আরও বেড়ে গেল।

রাজা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এক লাফে জোড়ের মুখে গিয়ে নতুন বড় ফাঁকটার ভেতরে তীব্র চোখে তাকিয়ে রইলেন। বরফের চাঁই নিজে থেকেই সরে গিয়ে, দু-আড়াই ফুট চওড়া একটা গর্ত তৈরি হল। গর্তের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে উবু হয়ে বসে খুব সতর্কভাবে রাজা নীচে লাফিয়ে পড়লেন। আমার উদ্দেশে অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'নির্ভয়ে নেমে এসো। লাফাও, এখানে পূর্ণ জ্যোৎস্না, অপার আনন্দসংগীত!'

নীচে নেমেই মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো! এরকম কিছু পৃথিবীতে আছে নাকি? এই কি স্বর্গ? নাকি এ পাতালরাজ্য? এ কি আমাদের পৃথিবীর কোনও অজানা দেশ? গত কয়েকদিনের সব বিস্ময় আমার ছাপিয়ে গেল । এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পৃথিবী!

আমাদের সামনেই জমাট বরফের সিঁড়ি খাড়া নেমে গেছে । এর শেষ কোথায়? কী আছে এই সিঁড়ির শেষে?

সামনে রাজা, পিছনে আমি, তীব্র কৌতূহলে নেমে চললাম । সিঁড়ির শেষে আবার একটা দীর্ঘ গুহা, তবে এটা একটা ঢাকা করিডরের মতো , ছাদ দেওয়াল মেঝে সব জমাট বরফের । পুরোটাই নীল আভায় ভরা । সংগীত এখানে আরও স্পষ্ট । হাজার হাজার কাচের ফাঁপা নল হাওয়ায় দোল খেতে থাকলে, পরস্পরের ঠোকাঠুকিতে যেরকম টুংটাং শব্দলহরী শোনা যায়, এই আওয়াজ অনেকটাই তেমনই, কিন্তু টুংটাং ধ্বনিতে এক অপূর্ব সুরের মায়াজাল সৃষ্টি হয়েই চলেছে ।

করিডর পেরিয়ে এসে দেখি সামনেই বিরাট বাগান । সারি সারি বরফের গাছ, গাছের ডালপালা থেকে ঝুলছে কাচের মতো সরু সরু পাতলা বরফের ফালি, তার সুরে-ধ্বনিতে আর নীল আলোর মায়ায় পুরো জায়গাটাই যেন এক জাদুরাজ্য । আশ্চর্যের ব্যাপার- শুধু করিডর ও ঘরবাড়িই বিরাট বিরাট চৌকো বরফের চাঁই দিয়ে তৈরি না, বাগান, গাছ, গাছের ডালপালা এমনকি গাছের পাতাও বরফের!



১১

এখন রাত কি ভোর তাও জানি না। এখানে কখন সকাল, কখন দুপুর, কখন সন্ধে, বোঝার উপায় নেই। আমাদের নিয়মে সূর্যের উদয়-অস্ত হয় কিনা, কিছুই জানি না।

রাজার মুখে আর কথা নেই। বরফের গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তিনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের ওপর তিনজন লোক ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁদের একজন বাকি দুজনের সঙ্গে কিছু বলাবলি করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মুখটা অবিকল আফ্রিকার মানুষদের মতো, রংটাই শুধু কুচকুচে কালোর বদলে ধপধপে ফরসা। মানুষটা ধীর পায়ে আমার কাছে এসে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে শান্তভাবে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখদুটিও কী শান্ত আর কী গভীর! চোখের ইশারায় তিনি আমাকে রাজার বেদির কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। এঁদের দুজনেরও মুখের রং ও গড়ন একই। চোখের দৃষ্টিতেও সেই আশ্চর্য শান্তি। সকলেরই দীর্ঘ দেহ, পোশাক বলতে সারা শরীর ভরে ভারি সুন্দর সব লতাপাতা আঁকা। জিরাফ বা চিতাকে দেখে যেমন আমাদের নগ্ন মনে হয় না, বরং মনে হয় এদের শরীরটাই রঙিন চিত্র, এখানকার মানুষের পোশাকহীন শরীরও তেমনই মনে হয় যেন লতাপাতার পোশাকে ঢাকা।

খুবই আশ্চর্যের কথা, আন্টার্কটিকায় এতদিন ধরে ঘুরছি, কোথাও কোনও লতাপাতাই দেখিনি। শুনেছি সমগ্র আন্টার্কটিকায় বা কুমেরুবৃত্তে এই ধরনের কোনও লতাপাতার অস্তিত্বই নেই। সামান্য উদ্ভিদ যেখানে যেটুকু দেখা যায়, তা নিছক শেওলাজাতীয়, অথচ এখানে এই বরফের বাগানে মেয়ে-পুরুষ সকলেরই সারা দেহে শুধু লতাপাতার ছবি!

রাজা উঠে বসে ব্যাগ থেকে তিনটি পাতলা পুঁথি বের করে তিনজনের সামনে মেলে ধরে একেকটা পাতা উল্টোচ্ছেন আর অন্য কাগজে আমার কাছে দুর্বোধ্য অক্ষরে একেকবার একেকরকম লিখছেন আর লেখার পর-পরই তিনজনের চোখে চোখ রাখছেন।

রাজা আমাকে পরে বলেছিলেন, ওই তিনটি পুঁথিই প্রাচীনকালের নানা উপজাতির লিপি-সংগ্রহ। পুঁথির একেকটি পাতা ওইরকম একেকটি জনগোষ্ঠীর ভাষার লিপিচিত্র। এর মধ্যে অধিকাংশ ভাষাই রাজা বহু পরিশ্রমে পড়তে-লিখতে শিখলেও উচ্চারণ না-জানায় একেবারেই বলতে পারেন না।

পুঁথি দেখিয়ে লাভ হল না। আমরা কোন পথে কীভাবে এখানে এলাম, বিশেষ করে আমাদের সমুদ্রযাত্রা কোথায় শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত কীভাবে দিগভ্রষ্ট হল, রাজা বরফের

ওপর সঙ্গের মার্কার পেন দিয়ে স্মৃতি থেকে ম্যাপ এঁকে সে-বিষয়ে তাঁদের যথাসাধ্য ধারণা দেবার চেষ্টা করেও কিছু বোঝাতে পারলেন বলে মনে হল না ।

বিরাট এই বরফের বাগান আর বাগানের ধারে ধারে চোখ জুড়ানো স্বচ্ছ বরফের ঘরবাড়ি, সব কিছুর ওপর নীল আলো আর সব কিছুর মধ্যে অপূর্ব সংগীত যে-কোনও মানুষকেই বিস্ময়ে বোবা করে দেবে । আমার মনের মধ্যে কত যে ভাবের ঢেউ উঠছে, সেই আশ্চর্য অনুভূতি লিখে বোঝানো যায় না । আমার কেবলই মনে হচ্ছে- সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর পুরো পৃথিবীর কেউই এই নীল আলো আর আশ্চর্য সংগীত কল্পনাও করতে পারবে না!

এখানে দিনের হিসেব কীভাবে করা হয় জানি না । রাজা তখনও তাঁর বিভিন্ন প্রাচীন লিপি দেখিয়ে এঁদের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের পথ খুঁজে চলেছেন । একবার মুখ তুলে রাজা আমাকে বললেন, ‘আমি বিভিন্ন প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর কয়েকটি ভাষা শিখেছি ভেবে এতদিন গর্ব বোধ করেছি, সব বৃথা, দরকারের সময় কোনও কাজে লাগল না ।’

চতুর্থ বা পঞ্চম বা হয়তো সপ্তম দিনে রাজা আমাকে বললেন, ‘যতদূর বুঝতে পারছি, এই বরফরাজ্যের মানুষের গভীর জ্ঞান । এঁরা এমন অনেক কিছু জানেন যা হয়তো আমরাও জানি না । এমন বিস্ময়কর সভ্যতা আমরা এখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি । কতকালের প্রাচীন কে জানে! যিজাস ক্রাইস্ট বা বুদ্ধার বহু যুগ আগের এ এক গুপ্ত সভ্যতা । তুমি আর আমি পরম ভাগ্যবান, এমন একটা অজানা, উন্নত সভ্যতার খোঁজ আমরাই প্রথম পেলাম ।’

আমার বোধহয় উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কোনওরকমে বললাম, ‘এ আবিষ্কার একা আপনারই । আমি তো শুধু আপনার সঙ্গে এসেছি ।’

আমার কথাটা বা তার অর্থ রাজার বোধহয় মনে ঢোকেনি, কতকটা নিজের মনেই বললেন, ‘আমি শুধু ভেবেছিলাম মনুষ্যবসতিহীন এই তুষাররাজ্যের গভীরে কোথাও না কোথাও আমাদের অজানা একটা বসতি আছে । তা যে একটা আলাদা সভ্যতা, কল্পনাও করিনি । হতে পারে, পৃথিবীর বাইরে এ একটা আলাদা পৃথিবী ।’

আন্টার্কটিকায় আসবার সময় জাহাজে রাজা আমাকে বলেছিলেন- যদি এই তুষারসাম্রাজ্যে হারিয়ে যান তাহলে আর হয়তো নিজের রাজ্যে ফিরবেন না । এখন বলছেন, ‘যেভাবেই হোক ফিরতে হবেই । এই নীল আভা আর স্বর্গীয় সুরের রহস্য নিয়ে ভাবতে হবে আমাকে । আমার দেশের বিজ্ঞানী আর সুরস্রষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে । তবে, দেশে কীভাবে ফিরব, আদৌ ফিরতে পারব কিনা জানি না ।’

রাজা যখন কিছুটা ব্যাকুল স্বরে আমাকে এইসব বলছেন, ঠিক তখনই আমার চোখে পড়ল, রাজার পিছনে বরফের গাছপালার আড়াল থেকে নানাবয়সি পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকে দু-হাত দুলিয়ে, নাচিয়ে, চোখ-মুখের নানারকম ইঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে নিঃশব্দে

কিছু বলাবলি করছে । প্রত্যেকেরই গায়ে সেই লতাপাতার চিত্রিত পোশাক । হাত দোলানোর ভঙ্গিও অদ্ভুত, অজানা কোনও নাচের মতো ।

রাজা হয়তো আরও কিছু বলতেন, সবচেয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটিকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে নীরব হয়ে রইলেন ।

লোকটা কাছে এসেই রাজার সামনে পাতলা পাথরের মতো চন্দনরঙের একটা বরফের পাত তুলে ধরলেন, তাতে বড় বড় হরফে সম্পূর্ণ অচেনা তিনটি শব্দ লেখা ।

ঠিক এই সময় বরফের গাছগুলোর আড়াল থেকে মেয়ে-পুরুষ সবাই বেরিয়ে এসে সমবেত নৃত্যে আমাদের তিনজনকেই ঘিরে ধরে বাগানের আরেকদিকে নিয়ে চলল । খুব উঁচু আর বিরাট একটা ঘরের সামনে পৌঁছে নৃত্যরত শৃঙ্খলাবদ্ধ দলটি দাঁড়িয়ে পড়ে শরীর হিন্দোলিত করতে লাগল । শুকনো খড়ের গাদায় আগুন লাগলে যেমন আগুনের শিখা পুরো গাদা জুড়ে লকলক করতে থাকে, বিরাট এই ঘরটার বাইরের দেওয়ালের সব জায়গা জুড়ে তেমনই নীল আলোর শিখা অবিরাম লকলক করছে । সেই নীল শিখায় মোড়া দেওয়াল ভেদ করে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরের কিছুই দেখা যায় না ।

একদিকের দেওয়াল লকলকে নীল শিখা সমেত নীচের দিকে ডুবে যেতে যেতে একেবারে মিলিয়ে গেল । দেহের হিন্দোল থামিয়ে নারী-পুরুষ সবাই আমাদের যেন কিছুটা আবিষ্ট বা প্রভাবিত করে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিতেই মিলিয়ে যাওয়া দেওয়ালটি এবার নীচের দিক থেকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে এসে আবার চারদিক বন্ধ একটা ঘর হয়ে গেল । মনে হয় যেন কাচের ঘর । বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা না গেলেও ভেতর থেকে বাইরের সবকিছুই দেখা যাচ্ছে । ঘরের বাইরে বরফের বাগান জুড়ে শুধু নীলের তরঙ্গ । সেই ঢেউও যেন খুবই মৃদুভাবে সংগীতের সুরে তালে বয়ে চলেছে । আর ঘরের ভেতরটা যেন সেই স্বর্গীয় সংগীতের উৎস, সংগীত যেন এখানে আমার চোখমুখ ছুঁয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ।

ঘরের ভেতর সংগীত শুনতে শুনতে এই প্রথম লক্ষ করলাম সকলের গায়েই আলাদা আলাদা লতাপাতার চিত্র । একজনের সঙ্গে আরেকজনের গায়ে ছবি ও নকশায় কোনও মিল নেই ।





শুধু সংগীতই নয়, ঘরের দেওয়ালে সিলিংয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, চারদিকের নীলাভ আলোরও জন্ম হয়তো এই ঘরেই । এঘরের দেওয়াল থেকে, ছাদ থেকে অবিরাম বিচ্ছুরিত হচ্ছে । ছাদ, দেওয়াল, মেঝে- কোনওটাই নাকি কাচ বা পাথরের নয়, শুধুই বরফের তৈরি ।

মেঝেয় সেঁটে থাকা প্রায় জীবন্ত মাছগুলোর ওপর আমার চোখ আটকে আছে দেখে রাজা নিচু হয়ে পরীক্ষা করে বললেন, ‘ওগুলো রঙিন পাথরের মনে হয় না । মাছ বলে আমার ধারণা, সবই আসলে সামুদ্রিক মাছের ফসিল । হয়তো এইসব মাছের অনেকগুলোই আজ বিলুপ্ত ।’

শুধু জীবন্ত-প্রায় এইসব মাছের ঝাঁকই নয়, ঘরের মেঝেটাও কিছুটা অদ্ভুত। দেওয়ালগুলো যেমন পালিশ করা কাচ বা পাথরের মতো মসৃণ, মেঝেটা তেমন নয়, বরং কিছুটা ঢেউ-খেলানো। তার ওপরে প্রচুর মাছ, যেন আঠা দিয়ে সাঁটা, অনেকগুলোর গায়েই নানান রং ও নকশা। দেখে মনে হয় জলের মধ্যে বিচরণ করতে করতে পাথর হয়ে এই মেঝেয় আটকে গেছে। হঠাৎই হয়তো লেজ দুলিয়ে, পাখনা নাচিয়ে চরে বেড়াবে!

তবে কি আমরা সমুদ্রের তলদেশে কোনও বরফের রাজ্যে চলে এসেছি? নাকি সমুদ্রতলেরও নীচে অজ্ঞাত কোনও বরফনগরে এসে পড়েছি?

আমার বোধহয় অবাক হবার সব ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, রাজাকে শুধু জিজ্ঞেস করতে পারলাম, ‘এখানে এঁরা এলেন কী করে? কোথা থেকে এলেন? তুষারভূমির এত নীচে এই বরফরাজ্যের বাইরে আমাদের পৃথিবীর কথাই বা এঁরা কীভাবে জানলেন?’

রাজা আমার চোখে চোখ রেখে বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকলেন, তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন, ‘ভাবতে হবে, জানতে হবে, গভীরভাবে বুঝতে হবে।’

‘বরফরাজ্যের বাইরে যাবার কোনও পথ এঁদের কাছ থেকে জানা যায় না?’

‘সেটা এঁদের জীবনের বাইরে, তাই জ্ঞানেরও বাইরে। পথ আমরাই খুঁজে বের করব, আমাদের দু’জনের স্মৃতিই প্রখর। দেশে আমাদের ফিরতেই হবে।’

১২

বরফনগরী থেকে বেরিয়ে গুহার পর গুহা পার হয়ে আগের সেই সুদীর্ঘ ঢালু গুহাপথ বেয়ে প্রথমে ওপরে উঠে ও পরে বিপরীত দিকের ঢালু বেয়ে নেমে আসা পর্যন্ত আমাদের পথ চিনতে খুব একটা কষ্ট হল না। এরপরই শুরু হল সেই সীমাহীন তুষারপ্রান্তর। সঠিক পথ বের করা এখানে অসম্ভব। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে যতদূর চোখ যায় সব হুবহু এক, সবই সাদা, যেন এক মহাশূন্যলোক সাদায় ঢাকা পড়ে আছে।

রাজার সেই দূরের সংকেত ধরার যন্ত্র বা তুষারক্ষেত্রের দিকনির্দেশক প্রাচীন মানচিত্র কোনওটাই আর সঙ্গে নেই, তার ওপর আকাশের মতো সীমাহীন এই তুষাররাজ্যের কোথায় কোন দিকে সমুদ্র, রাজা অনেক মাথা খাটিয়েও ধারণা করতে পারছেন না। সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে আন্দাজে মাইলের পর মাইল শুধু বরফরাজ্যে ঘুরে মরাই যেন আমাদের নিয়তি। কনকনে হাওয়ায় তুষারপাতে সর্বগ্রাসী হতাশায় আশ্চর্য বরফের বাগানও এখন স্বপ্নের মতো মিথ্যে হয়ে গেছে।

একসময় অনেক দূরে সাদা বরফের ওপর কয়েকটা চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন দেখে মনে ক্ষীণ একটা আশা জাগল। গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে তুষারে মুখ ডুবিয়ে বুক চেপে শুয়ে আছে। দূর থেকে শুধু তাদের কালো ডানা দেখে মনে হয় যেন মরে পড়ে আছে।

আশায় বুক বেঁধে আমরা পেঙ্গুইনগুলোর দিকে এগোতে লাগলাম। হয়তো ওইদিকেই কোথাও সমুদ্রতীর আছে।

প্রায় সূর্যাস্তের মুখে পেঙ্গুইনগুলোর কাছে পৌঁছে সমস্ত মন আবার হতাশায় ভেঙে পড়ল। কোথায় পেঙ্গুইন? এ তো সেই জলদস্যুদের স্লেজ! তিনটে কুকুরের দেহের কোনও কোনও অংশও তুষারের ফাঁক দিয়ে তখনও দেখা যাচ্ছে। বাকি তিনটে কুকুরের কোনও চিহ্ন নেই। স্লেজগাড়িটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ভেতরে কেউ নেই। আরোহী দুজন রাজাকে আহত ও অজ্ঞান করে তাঁর যন্ত্র ও মানচিত্র ছিনিয়ে নেবার পাপে এই ভয়াবহ বরফরাজ্যে প্রাণ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করেছে!

আমাদের হয়তো বিনা পাপেই একই পরিণাম হতে চলেছে। তার ওপর ভয়ানক তুষারপাত ক্রমেই বাড়ছে। তা থেকে কিছুটা অন্তত বাঁচতে আমরা স্লেজে উঠে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে দুজনে হয়তো একইসঙ্গে মানুষের পৃথিবীতে ফেরার উপায় ভাবতে লাগলাম।

বরফরাজ্যের ওপর তুষারপাত আরও ঘন হয়ে উঠেছে । এর মধ্যে বেশ কয়েকবার রাজার সেই সঞ্জীবনী সুগন্ধ বড় বড় শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিয়েছি । তাঁর আনা ভিটামিন-মিনারেলের পাকানো কাঠিও খেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে ।

রাজা একদৃষ্টে দীর্ঘক্ষণ তুষারপাতের দিকে চেয়ে গভীরভাবে ভেবেই চলেছেন । কখনও-বা দুচোখ বুজে চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন । আমার হঠাৎ মনে হল- বেঁচে আছেন তো!

অসীম প্রান্তরে অবিরাম তুষারবৃষ্টির মধ্যে এ কীসের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি? মৃত্যুরই তো? চরাচরব্যাপী তীব্র তুষারপাতে প্রাণঘাতী ঠান্ডায় মৃত্যু ছাড়া আর কে আমাদের বাঁচাতে আসবে এখানে!

কখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, বিশাল চেহারার একটা দানব আমাকে আচমকা দুহাতে আকাশে তুলে বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলতেই বুঝলাম বেঁচে আছি, কিন্তু জীবনের মেয়াদ আর বেশি নেই । দানবটা এবার আমাকে ছেড়ে রাজাকে জাপটে ধরে নিজের চিবুক দিয়ে তার মাথায় বার বার আঘাত করতে লাগল । একইরকম বিকট চেহারার সঙ্গী দস্যুটা রাজার ঘাড়ে রিভলবার চেপে রেখে হুংকার দিয়ে উঠল, 'হোয়্যার আর দ্য ব্লু ডায়মন্ডস? গিভ আস অল রাইট নাও!' (নীল হিরেগুলো সব কোথায়? এক্ষুনি বের করে দাও!)

রাজা এক ঝটকায় রিভলবারটা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সোজা তার কপালে গুলি করলেন । যে লোকটা তাঁকে জাপটে ধরে ছিল রাজা তার বুকে নিজের মাথা দিয়ে খুব জোর একটা ধাক্কা দিতেই লোকটা অদ্ভুত গলায় কঁকিয়ে উঠে বরফের ওপর গিয়ে পড়ল । রাজা তার দিকে রিভলবার তাক করবার আগেই লোকটা দৌড় লাগাল । এবার রাজা আমাকে সুস্থ করে তুলে বললেন, 'জলদস্যু-দুটো নীলাভ আলো দেখে হয়তো ভেবেছিল গুহায় প্রচুর নীল হিরে আছে । বড় আকারের নীলার দীপ্তি অনেকটা এইরকমই । ওরা ধরে নিয়েছিল আমরা সেই নীল হিরের খনির হদিশ জানি, আমাদের ওপর নজরও রেখেছিল সেইজন্য ।'

গুলি-খাওয়া লোকটার পুরু চামড়ার বিশাল ওভারকোটের বেশ খানিকটা খুলে গেছে, ভেতরে দপদপ করে আলো জ্বলছে দেখে রাজা এক লাফে দেহটার কাছে গিয়ে ওভারকোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ওয়াকিটকি ধরনের ভারী যন্ত্র বের করে আনলেন । তার একদিকে ছোট্ট একটা স্ক্রিন । তাতে পর পর কতগুলো অচেনা সংখ্যা ও শব্দ জ্বলছে-নিভছে ।

যন্ত্রটা কানের কাছে নিয়ে রাজা পরীক্ষা করলেন, যদি কোনও শব্দ শোনা যায় । বার-কতক ঝাঁকিয়েও দেখলেন, যদি রহস্যভেদ করা যায় । তারপর নিজের মনে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই বেতারযন্ত্র, তাছাড়া আর কী হতে পারে?'

ঠিক এইসময় ঝড়ের শিসের মতো চাপা হিসহিসে শব্দে 'লোলুখ' 'লোলুখ' শুনে দুজনেই চমকে উঠলাম। আওয়াজটা এই যন্ত্রের মধ্যে থেকেই আসছে। কেউ যেন কাউকে তীব্র স্বরে ডাকছে। একটু পর পর ওই একই নাম ধরে ডেকে চলেছে। আমরা আরও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যখনই 'লোলুখ' 'লোলুখ' শোনা যাচ্ছে ঠিক তখনই স্ক্রিনের ওপর শব্দ ও সংখ্যাগুলি আরও দ্রুত জ্বলছে-নিভছে।

'ইওর এক্সসেলেন্সি' আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বললাম, 'দা মনস্টার'স অ্যালাইভ!' (দৈত্যটা বেঁচে আছে!)

গুলি-খাওয়া দস্যুর বিরাট দেহটা বরফের ওপর কেউ যেন ধরে পা থেকে মাথা অব্দি মোচড়াচ্ছে। তার আধখোলা ওভারকোটের ভেতর আগেরটার মতো আরও একটা আলো জ্বলছে নিভছে!

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও কেন জানি না সতর্ক হয়েই আমরা মোচড়-খাওয়া দেহটার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার চোখ খোলা, কিন্তু তাতে কোনও সাড় নেই। বরফে গুলির এক ফোঁটা রক্তের দাগও দেখা গেল না। শুধু কপালে গুলির গর্তের মুখটায় মস্ত একটা চুনিপাথরের মতো জমাট রক্ত। ওভারকোটের ভেতরে কোথাও আলোর দপদপানি বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে।

রাজা বরফে ঝুঁকে লোকটার ওভারকোটের ভেতর থেকে হুবহু একরকমের আরও একটা যন্ত্র বের করে আনলেন। তারপর দুটো যন্ত্রই পাশাপাশি দুহাতে নিয়ে দুটোর আলোর লেখা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একবার এটার একবার ওটার নবগুলো ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ কী একটা ভাষায় শিঙাধ্বনির মতো গলার আওয়াজ শুনে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'এ নিশ্চয়ই রেডিও! মেক্সিকোর আদি রেড ইন্ডিয়ানদের গলা! ওখানকার কোনও রেডিও স্টেশন এক পলকের জন্য ধরেছিলাম!'

দ্বিতীয় বেতারযন্ত্রটা বের করে নেবার পরই লোকটার দেহের মোচড় খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁকুনিতে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে দেখা গেল।

রাজা লোকটার নাকের সামনে হাতের উল্টো পিঠ প্রায় ঠেকিয়ে রেখে পরীক্ষা করলেন, নিঃশ্বাস বইছে না। দেহেও সাড় নেই।





দুজনের চেষ্টায় লোকটার গা থেকে আপাদমস্তক ঢাকা মস্ত ভারী চামড়ার ওভারকোট ছাড়িয়ে নিয়ে তা দিয়েই আমরা নিজেদের ঢেকে নিলাম।

এবার স্লেজে বসে রাজা রেডিও দুটো ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখে একমনে দুটোরই নব ঘোরাতে লাগলেন। হঠাৎই আবার সেই 'লোলুখ' 'লোলুখ' শুনে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এবার তার হিসসিসে গলা নয়, রাগী স্বর, যেন রাগে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে লোলুখকে ডাকছে।

এটা প্রথম পাওয়া রেডিওয় শোনা গেল। রাজা তাঁর সেই উপজাতিদের ভাষার পুঁথি বের করে দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগলেন। একটা পাতায় তাঁর চোখ আটকে গেল। বেশ

কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমাকে বললেন, ‘লোলুত্থ মানে কী জানো? আমরা আসছি। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের আফ্রিকান উপজাতির ভাষা।’

তবে কি অনেক আগেই এরা ভুল করে নীল হিরের হদিশ পাওয়ার কথা ভেবে নিয়েছে, নাকি দৈত্যদুটোর বিপদ-সংকেত পেয়ে গেছে?

রাজা আমার উদ্বেগের কথা শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ‘মনে হয়, দুটোই।’

ঠিক তখনই আবার শোনা গেল, ‘লোলুত্থ’ ‘লোলুত্থ’। গলার আওয়াজ অধৈর্যে অস্থির, রাগে ফেটে পড়ছে।

রাজা আরও একবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ‘দেশে ফেরার আশা বোধহয় তুষারেই চাপা পড়ল। এরা কোথায় আছে দলের লোকেরা বোধহয় তার সংকেত ধরতে পারছে। এরাই হয়তো সেই সাংঘাতিক জলদস্যুর দল।

‘এ আপনি কাদের কথা বলছেন?’

১৩

'ম্যাপে তোমাকে সমুদ্রের বুকে হিমবাহের মধ্যে যে সুড়ঙ্গ দেখিয়েছিলাম, যার গহ্বরে মধ্যযুগের এক দুর্ধর্ষ জলদস্যুর সারাজীবনের ধনরত্ন লুকনো আছে, আমার দেশের এক দুঃসাহসী নাবিকের কাছে শুনেছি, তার বংশধরেরা নাকি কিছুকাল যাবৎ পূর্বপুরুষের পেশায় নেমে পড়েছে । এরা নাকি আরও সাংঘাতিক । আরও বড় দল নিয়ে সমুদ্রে লুঠতরাজ চালায় । তাদের পূর্বপুরুষের লুকনো ধনরত্নের সন্ধানে তারা পাগল হয়ে সমুদ্র তোলপাড় করে । কথাটা শুনে আমি বিশ্বাস করিনি । এখন মনে হচ্ছে আমার দেশের নাবিক হয়তো ঠিকই বলেছিল । এই দুজনকেও হয়তো তারাই পাঠিয়েছে ।'

রাজা একটা কোনও ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, হয়তো হিংস্র জলদস্যুদের কথাই ভাবছেন, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমাদের সেই দুঃসাহসী নাবিক নিজেও দলবল জুটিয়ে লুকনো ধনরত্নের খোঁজে কয়েকবার সমুদ্র অভিযান করেছে, এখন বদ্ধ উন্মাদ ।'

কথা হচ্ছিল স্লেজে বসে । পার্কার ওপর চামড়ার ওভারকোট জড়িয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাত থেকে কিছুটা বাঁচলেও, পথ চিনে দেশে ফেরার কী উপায় হবে ভেবে কুল-কিনারা পাই না । রাজার মুখ যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেও ভরসার কিছু দেখছি না । দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে, প্রাণঘাতী ঠান্ডায় রক্ত জমে গিয়ে নীল হয়ে মরে যাওয়া ছাড়া আর যখন কোনও ভবিষ্যতই দেখতে পাচ্ছি না, সেই সময় আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ল- লোলুখ! লোলুখ!

এর মানে কী? জলদস্যুর দল তাদের লোকের সন্ধানে এদিকে আসছে? বা নীল হিরে উদ্ধারে সম্পূর্ণ দুর্গম এই তুষাররাজ্যে হানা দেবে! তারা কি ভেবে নিয়েছে তাদের অনুমানমতো আন্টার্কটিকায় নীল হিরের খনির খোঁজ পাওয়া গেছে! তাদের পাঠানো লোক দুটো স্লেজ বোঝাই করে নীলা পাথর নিয়ে দুর্গম দুর্বিষহ তুষারক্ষেত্র থেকে ফেরার চেষ্টা করছে! অথবা ফেরার পথে বিপদে পড়েছে! বা প্রাণ হারিয়েছে? এখান থেকে তারা কী বেতার সংকেত পাচ্ছে জানি না ।

রাজা একমনে দুটি বেতারযন্ত্রের নব ঘুরিয়েই চলেছেন । একটা যন্ত্র থেকে ভয়ানক জোরে বাজ পড়ার মতো শোনা গেল- মুখান্যন? মুখাল্লথ!

রাজা নিমেষে যন্ত্রের ভল্যুম কমিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পুঁথি বের করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আগের সেই লিপিতে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন- 'মুখান্যন? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

মুখাল্লথ- সাড়া দাও । নিশ্চয়ই তারা এদিকে আসছে! দলের লোক দুটো আন্টার্কটিকার ঠিক কোথায় আছে তার অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বেতার সংকেত থেকে জানতে পারছে নিশ্চয়ই!'

দুজনে দুটি জড়পদার্থের মতো বসে আছি । অসীম তুষারক্ষেত্রে আমরা যেন দুটি নিস্তেজ গুবরেপোকা । বাঁচবার চেষ্টাহীন, ভবিষ্যৎহীন, হয়তো অনেক আগেই মরে গেছি । হয়তো মহাকাশের মতো সীমাহীন তুষারলোকে আমরা দুটি শবদেহ পড়ে আছি ।

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে থাকা দুটি বেতারযন্ত্রই অদ্ভুত শব্দ করে জ্বলে উঠল । তাতেই মনে হল এখনও বেঁচে আছি!

রাজা চমকে উঠে যেন চেতনা ফিরে পেলেন । চঞ্চল হাতে দুটি যন্ত্রই কালো চশমা ঢাকা চোখের সামনে ধরে ছোট ছোট স্ক্রিন দুটোয় আলোর বর্ণমালা পড়তে লাগলেন ।

উত্তেজনায় চোখ থেকে একটানে কালো চশমা খুলে ফেলে আরও কিছুক্ষণ বর্ণমালার দৌড়োদৌড়ি নিরীক্ষণ করে তিনি স্লেজ থেকে এক লাফে তুষারের ওপর নামলেন । হ্যাচকা টানে আমাকেও নামিয়ে আনলেন । আমাদের হাঁটু অব্দি তুষারে ডুবে গেছে ।

দুজনেই বরফের ওপর শুয়ে পড়ে কৌশলে পুরু নরম তুষারের মধ্যে থেকে পা বের করে নিয়েছি । রাজা শুয়ে শুয়েই পা-ডোবা দুটো গর্ত আরও গভীর করে খুঁড়ে তার মধ্যে বেতারযন্ত্র-দুটো পুঁতে তার ওপরে তুষার চাপা দিলেন । তারপর এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে উঠে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'কেন দাঁড়িয়ে আছো? পালাও, পালাও, যতক্ষণ বাঁচি শুধু পালাতে হবে!'

তুষারের ওপর আমরা প্রায় দৌড়োচ্ছি । রাজা ওই অবস্থায় জোর করে কথা বলছেন । গলা রাগে গরগর করছে । বললেন, 'নির্বোধের মতো রেডিও-দুটো কাছে নিয়ে বসেছিলাম । ওই বেতারসংকেতে ওরা বুঝে গেছে আমরা ঠিক কোথায় আছি । যন্ত্র-দুটোর কাছ থেকে যত দূরে যত দ্রুত পারো পালাও!'

আকাশ গোলাপি আভায় ভরে উঠছে । অনন্ত তুষারে মৃত্যুর কোলে বেঁচে থাকার হয়তো আরও একটা দিন শেষ হচ্ছে অথবা নতুন আরেকটা দিন শুরু হচ্ছে । দুইয়ের মধ্যে মাত্র এক-আধঘন্টার ব্যবধান । আমাদের যেমন বেঁচে থাকা আর না-থাকার মধ্যে ।

তুষারের বুকে কীভাবে প্রায় দৌড়োচ্ছি জানি না । রাজা অনেকটাই এগিয়ে গেছেন, আমি প্রাণপণে তার অনুসরণ করছি । জীবন-মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মনে হয় আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে ।

এবার আমার চোখের সামনে যেন অন্ধকার নামল- রাজা তুষারের ওপর আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন ।

কাছে গিয়ে দেখি, তুষারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে তিনি দুহাতে তুষার সরিয়ে তাঁর হারানো যন্ত্রটা তুলে আনছেন । দস্যুদুজন এটা এখানেই ফেলে গেছে । হয়তো কিছু না

বুঝেই । যন্ত্রটা দাঁড় করিয়ে মিটারগুলো ভালো করে দেখতে দেখতে প্রায় নিজের মনে রাজা বললেন, 'এটাই এখন আমাদের বাঁচবার একমাত্র অস্ত্র!'

বিভিন্ন কাঁটার অস্থির চালচলন দেখে সামনের দিকে এগোতে এগোতে রাজা এবার আমাকে বললেন, 'লক্ষ রেখো, ম্যাপটাও যদি পাওয়া যায় । আমার আন্দাজ হচ্ছে দস্যুরদল ওদের বেতারযন্ত্রের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে । আমরা এবার ক্রমশ বাঁদিকমুখো এগোব । আমার অনুমান ওরা যন্ত্রের সংকেত ধরে ডানদিকে যাবে ।

তুষারে গেঁথে রেখে রাজা তাঁর রেডারজাতীয় যন্ত্রের মিটারগুলো খুব ভালো করে দেখে বললেন, 'চারদিকেই চোখ রাখো । মনে হচ্ছে দস্যুদের বিরাট একটা দল এদিকেই আসছে । ঝড়ের গতিতে তারা ধেয়ে আসছে ।'

সূর্য যখন মাথার ওপর, তখন অনেক দূরে সাদা তুষারের বুকে সারিবাঁধা কালো পোকার মতো কিছু একটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম ।

জ্বলন্ত সূর্য ক্রমশ আবার আড়ালে গিয়ে আকাশ লালে কমলায় হলুদে ভরিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলাপি আভা ছড়াবার সময় রাজা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান স্বরে বলে উঠলেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো! অনেকগুলো স্লেজে তুষারঝড়ের মতো ছুটে আসছে । দীর্ঘ কালো রেখাটা কী জানো? হাস্কি কুকুরের পাল!'

কালো রেখাটা দেখতে দেখতে আবার বললেন, 'তার মানে ওইদিকে কোথাও সমুদ্র আছে । অথবা বহু দূরের সাগর বা উপসাগর থেকে দীর্ঘ সৈকতব্যাপী তুষারস্তূপ কেটে চলবার মতো কোনও বাহন ওদের আছে । না হলে এতগুলো স্লেজ আর ওই কুকুরের পাল নিয়ে এই অজানা অনন্ত তুষারক্ষেত্রে তারা এল কী করে!'

যন্ত্রটা কাঁধে ফেলে রাজা এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন । আমি বারবার পিছিয়ে পড়ছি দেখে রাজা রূঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'মরতে হলে অসম্ভব কিছু করে তারপর মরো । তুমি না বলেছিলে তোমার নামের মানে ইমমর্টাল! অমর! যা কিছু রোজ ঘটে তার মধ্যে জীবন কাটানোর অভ্যাস ভেঙে ফেলো । না হলে এত দূর এলে কেন? অসম্ভব কিছু করো, তাতে মরতে হলে মরবে!'





‘আমি আর হাঁটতে পারছি না!’

‘পারতে তোমাকে হবেই । ওরা যেদিকে এগোচ্ছে, তার উল্টোদিকে আমাদের যেতেই হবে । এই ডানদিক বরাবর । ওরা ভয়ঙ্কর! ওরা সশস্ত্র! বিরাট একটা দল আসছে! আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমরা দুজন খালি হাতে দু’মিনিটও ওদের বাধা দিতে পারব না ।’

রাজার কোনও কথা আমাকে ছুঁতে পারছে না কেন? প্রচণ্ড বমির তোড়ে যেমন সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ে আমিও তেমনই আপাদমস্তক ভেঙে পড়তে পড়তে বললাম, ‘আমাকে ফেলে আপনি এগিয়ে যান, ইওর এক্সসেলেন্সি!’

রাজা তুষারের ওপর কাঁধের যন্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে এক ঝটকায় আমাকে সোজা দাঁড় করিয়ে আমার দুই বাহু ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বজ্রগর্জনে বললেন, 'দৌড়োও! দৌড়োও! দৌড়োতে তোমাকে হবেই!'

একহাতে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে আরেক হাতে আমার একটা বাহু ধরে আমাকে টেনে হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে রাজা প্রায় দৌড়োতে লাগলেন। শুধু যখন তাঁর লম্বা যন্ত্রটা তুষারে দাঁড় করিয়ে দস্যুদলের অবস্থানের হদিশ নিতে হয় শুধু তখনই যা একটু বুক ভরে দম নিতে পারি। সব ক'টা মিটারের কাঁটার চাঞ্চল্য লক্ষ করে দূর অনন্তের বুকে দুয়েক মুহূর্ত স্লেজগাড়ির সারি বা গাড়ি টানা কুকুরের পালের কালো রেখাটা খোঁজেন। সেই ফাঁকেই আমরা সঙ্গের শিশি খুলে ফুলের গন্ধ নিই। আমাকে তাঁর অমৃতকাঠি দিয়ে তিনি নিজেও একটা মুখে নেন। এই সাংঘাতিক সময়ে গোমুখের সাধুর দেওয়া জলও এই প্রথম আমার মতো তিনিও মুখে দিলেন।

একবার নরম তুষারের ওপর যন্ত্র বসাতে গিয়ে রাজা থমকে গেলেন। কাছেই তুষারস্তূপের ভেতর থেকে চামড়ার ওভারকোটে ঢাকা একটা হাত উঠে আছে! আরও কাছে যেতে বোঝা গেল দস্তানাসুদ্ধু হাতের দুটো আঙুল একটু একটু নড়ছে। বরফের নীচে লোকটা তাহলে এখনও বেঁচে আছে!

দুজনে মিলে তুষারস্তূপ খুঁড়ে প্রথমেই লোকটার নাক-মুখ বের করে আনতেই চমকে উঠলাম, এ তো সেই দুই দস্যুর একজন, রাজা গুলি করবার আগেই যে এঁকে বেঁকে দৌড়ে পালিয়ে ছিল।

রাজা লোকটার ওভারকোটের জিপার একটু ফাঁক করে নীচের আরও কয়েক প্রস্থ আচ্ছাদন সরিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন, দেহে তাপ নেই, তবে মাঝে মাঝে খুব ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস বইছে। দ্রুত লোকটার পায়ের দিকে সরে তার হাঁটু অব্দি চামড়ার জুতো টেনে হিঁচড়ে খুলে মোজার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পায়ের পাতার তাপ পরীক্ষা করতে যাচ্ছিলেন, সন্তর্পণে কী একটা বের করে আনলেন। এ সেই তাঁর লুট হওয়া ম্যাপ!



ম্যাপটা খুলে ধরে ভালো করে দেখে যন্ত্রটা এই প্রথম তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না । ছোটো, ছোটো, যত দ্রুত পারো ছোটো, ডানদিক বরাবর! দেশে ফেরবার শেষ চেষ্টা করে দেখি!'

'লোকটার ওভারকোট খোলাই রেখে এলেন, বন্ধ করতে বোধহয় ভুলে গেছেন । এবার তো মরেই যাবে!'

'যুদ্ধে শত্রুর শেষ রাখতে নেই । ওরা আমাদের ওপর অন্যায় আক্রমণ করেছে ।'

একে তো প্রায় দৌড়োচ্ছি, তার ওপর হাতে ভারী যন্ত্রটা! এর মধ্যে বার কতক রাজা যন্ত্র নিয়ে কাঁটার গতিবিধি দেখলেন, ম্যাপ দেখলেন, সামান্য দুয়েকটা কথা যা বলছেন তাতে মনে হয় তাঁর মনে দেশে ফেরার আশা ক্রমেই বাড়ছে ।

আন্টার্কটিকায় এই সময়ের আকাশে রং বদলানোর রীতি ভেঙে হঠাৎই গোলাপি আভা যখন নিমেষে মুছে গেল তার বেশ কিছুটা পরে বোঝা গেল রাজার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল! আন্টার্কটিকার প্রচণ্ড গতির এই ঝড়ে হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব । সামনের দিকে সোজা এগোতে পারলে বড় একটা বরফের পাহাড় কিংবা তুষার গুহার মতো কিছু আছে মনে হচ্ছে । পাহাড় বা তুষারস্তূপের আড়াল নিতে পারলে রাক্ষুসে ঝড়ের ধাক্কা থেকে হয়তো আত্মরক্ষা করা যাবে । হঠাৎ তুষারের আকাশসমান উঁচু তরঙ্গোচ্ছ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে গেল । তার মধ্যেই আমরা প্রাণপণে বরফপাহাড় বা তুষারগুহার দিকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম । অল্প পরে ঝড়ের দাপট কিছুটা কমে এল । চরাচর ঢাকা তুষারের তাণ্ডবনৃত্য ক্রমশ ঢিমে হয়ে চারদিক আবার ঝাপসামতন দেখা দিতে লাগল । তারপর যখন চোখের সামনের পুরু তুষারপর্দা পুরোটাই সরে গেল, আমরা তখন মৃত্যুর বিরাট হাঁয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি!

রাজার যন্ত্রের দূরদৃষ্টি, ম্যাপের দিকনির্দেশ সবই সম্পূর্ণ ভুল পথে ঠেলে দিয়েছে আমাদের ।

১৪

বরফপাহাড় বা তুষারস্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে পর পর অনেকগুলো স্লেজগাড়ি। কুকুরের পালও সব তুষারে ঢেকে সাদা, কালো চামড়ার পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা বিরাট-আকার লোকগুলোও তুষার মেখে এতই সাদা হয়ে আছে যে এদের দস্যু বলে চিনতেই যা একটু সময় লাগল, চেনা মাত্রই আমাদের সামনে নিশ্চিত ভয়ংকর মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

প্রবল হাওয়ার কমা-বাড়ার সঙ্গে তুষারের ঝাপটাও কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। ঝড়ের একটানা চিৎকার শুধু একভাবে আমার বুক চিরে দিচ্ছে। সাংঘাতিক বিপদের সঙ্গে জীবনে আমি অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু এরকম পরিত্রাণহীন বিকট মৃত্যুর মুখোমুখি হইনি।

'দ্যাখো কী সুন্দর! কী আশ্চর্য প্রকৃতির রূপ!'

রাজার গলায় এই অদ্ভুত কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন! তাঁর মন এত চাপ আর নিতে পারল না!

আমাকে তাঁর দিকে ফিরতে দেখেও যেন দেখলেন না, নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো বললেন, 'জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো এমন সুন্দরের শুশ্রূষা পাব, কখনও কল্পনা করিনি। মরবার আগে এই দেবলোকে এসে মন আমার জুড়িয়ে গেল।'

দস্যুরা চিৎকার করে কিছু একটা বলে হুংকার দিতে দিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তুষারে হাঁটু অব্দি গেঁথে গিয়ে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায় না। মন্দিরে বলির ঘন্টাধ্বনির মতো দূর থেকে ভেসে আসছে- 'মুখাঢম' 'মুখাঢম'। রাজার কানে কি সেই হুংকার পৌঁছচ্ছে? 'মুখাঢম' মানে কী?

ঝড় হঠাৎ আবার বেড়ে গেল। তুষারের ঝাপটাও এখন প্রবল।

রাজার উরু পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে দেখে আমি তাঁকে ধাক্কা দেবার জন্য তাঁর আরও কাছে যেতে গিয়ে আটকে গেলাম, আমারও উরু পর্যন্ত তুষারে গেঁথে গেছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে রাজার মাথা থেকে শরীরের বাকি অংশ সাদা। দেখাচ্ছে যেন বরফগুঁড়োয় তৈরি মানুষের মূর্তি। রাজা মূর্তির মতোই নীরব, নির্বাক।

বহু কসরত করে চোখ থেকে কালো ইউ-ভি ফিল্টার লাগানো চশমার তুষার পরিষ্কার করেও সামনের দৃশ্য ভালো দেখা গেল না। তুষারাচ্ছাদিত কুকুরের পাল এক জায়গায়

দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে, তাদের মাথা ও পিঠের ওপর দিয়ে তুষারঢাকা আরোহীদের মাথা থেকে বুক অব্দি শুধু ঝাপসা মতো দেখা যাচ্ছে।

ঝড় বেড়েই চলেছে।

এ কি সেই আন্টার্কটিকার সবচেয়ে কুখ্যাত ঝড়, ঘন্টায় দুশো মাইল বেগে ছোটে! সব উড়িয়ে নিয়ে যায়!

বিপদের ওপর বিপদ, হঠাৎ রাজার প্রলাপ বকা শুরু হল। নিজের দেশের ভাষায় যেন স্তোত্র পাঠ করছেন। তাঁর গলার স্বর এমনিতে গভীর, মাধুর্যময়, গম্ভীর, এখন তাতে আরও কী-একটা যোগ হয়েছে।

রাজা কালো চশমা খুলে ফেলে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে ইংরিজিতে বললেন, 'এমন অসীম সাদা আমার দেশের সব কালো ধুইয়ে দিক। এই অনন্ত সাদা মানুষের মনের সব কালো ধুইয়ে দিক।' আবার সেই মাতৃভাষায় স্তোত্র পাঠ।

শেষবার তাঁর দেশ থেকে আনা শিশির ছিপি খুলে ফুলের ঘ্রাণ নেবার পর শিশিটা তিনি আমার কাছেই রেখেছিলেন, আমারই ওটা বেশি দরকার হয়। অমৃতকাঠির বাক্সও আমার কথা ভেবে আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে দুটোই বেশ কয়েকবার আমার কাজে লেগেছে। রাজা নিয়েছেন মাত্র দুবার।

এবারও আমি গন্ধ নিয়ে, মুখে কাঠি ফেলে রাজাকে দিতে গিয়ে থেমে গেলাম, তাঁর গলায় তখন মনপ্রাণ-জুড়নো এক অদ্ভুত শান্ত সুর। কথা খুব কম, ভাষাও আমার অজানা।

চরাচর আবার আগের মতো সাদা একটা মহাশূন্যের রূপ ধরছে। যতটুকু দেখা গেল, হয়তো কিছুই দেখা যায়নি, শুধু অনুমানে বোঝা গেল- সামনের দস্যুদল স্লেজ সুদ্ধু হয় তুষারে চাপা পড়েছে নয়তো ঝড়ের ধাক্কায় দূরে কোথাও উড়ে গেছে। চাপা পড়াই বেশি সম্ভব, কেননা বরফপাহাড় বা তুষারস্তূপের কাছে তুষারপাতের পরিমাণ এদিকের চেয়ে অনেক বেশি, তুষার স্তূপ গড়ে ওঠার কারণও তা-ই। ভয়ংকর কুকুরগুলোও অদৃশ্য, শুধু তাদের একটানা অবিরাম ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে, ঝড়ের সাংঘাতিক শব্দে ঢাকা পড়া দূরাগত নিস্তেজ সে আওয়াজ।

রাজার কণ্ঠে প্রার্থনার স্বর শুনে মনে হল তিনি হয়তো মাতৃভাষায় দেশের কালো, মনের কালো ধুইয়ে দেবার কথাই গেয়ে চলেছেন। দেহের প্রায় অর্ধেক তুষারে গাঁথা, বাকিটা যেন নরম মার্বেল পাথরের মূর্তি।

আমি তাঁর মতো অতটা তুষারে ডুবে যাইনি, তবে চেহারা নিশ্চয়ই সাদায় মোড়া।

বাঁচবার সব আশাই চুরমার, মৃত্যু ঠেকাবার মতো মনের জোর অনেকক্ষণই শেষ, তবু রাজাকে ক্রমশ বরফে ডুবে যেতে দেখে মন হাহাকার করে উঠল। কিছু না ভেবেই আমি

শরীর মুচড়ে কাৎ হয়ে বরফের ওপর শুয়ে বহু কসরত করে প্রথমে ডান পা, তারপর বাঁ পা বের করে আনলাম।

'আপনি বাধা দেবেন না, আমাকে অনুমতি দিন' জোড়হাতে একথা বলে রাজার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে আমি তাঁকে পা পোঁতা অবস্থাতেই বরফের ওপর বসিয়ে দিলাম। তারপর তাঁকেও তুষারগর্ভ থেকে বাইরে নিয়ে এলাম।

কুকুরের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। দস্যুদেরও সাড়াশব্দ নেই। আমরা দু'জনে যতটা পারি পেঙ্গুইনদের মতো বুকে হেঁটে গুহার দিকে এগোতে লাগলাম।

রাজা আর নিজের জ্ঞানে বা চেতনায় আছেন কিনা বোঝা যায় না, মুখে কথা নেই, মনে হয় যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে হয়তো আমাকে সামনে পেয়ে আমারই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। যা বলছি তা-ই শুনছেন, কিছুতে কোনও বাধা দিচ্ছেন না।

বরফের পাহাড় বা জমাট তুষারস্তূপ যা-ই হোক, তার গুহায় ঢোকবার পথ নেই। গুহার মুখ খুবই চওড়া ও উঁচু কিন্তু প্রায় পুরোটাই বরফে ঢাকা। গুহার সামনে থেকে ভেতরে ঢালু হয়ে উঁচু বরফ জমে আছে।

অসীম তুষারক্ষেত্রে অনেক জায়গায় আমাদের বরফের পাহাড় ডিঙোতে হয়েছে, এখানে তুষারগুহার মুখে জমা বরফের ঢালু পার হয়ে গুহার ভেতরে ঢুকতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হল।

দীর্ঘ গুহা, কতদূর গেছে কে জানে! তুষারসমাধি হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেন আবার সব কিছুর সঠিক অর্থ বুঝতে পারছি। বাঁচবার উপায় চিন্তার ইচ্ছাও ফিরে পাচ্ছি। গুহাটা বেশ উঁচু। ভেতর পর্যন্ত আলো আসে। তবে ঠান্ডা ও ঝড়ের আক্রমণ থেকে কতটা নিরাপদ বোঝা দরকার। গুহার উল্টো মুখে এগোতে গিয়ে একটা ঘুমন্ত মানুষের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

সামলে নিয়ে মানুষটার মুখ দেখে আমার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না। স্পেন বা পর্তুগালের মানুষ, অভিযাত্রীও হতে পারে, সন্তও হতে পারেন। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

রাজার কাছে ফিরে গিয়ে পুরো ঘটনাটা তাঁকে বললাম। আমার উত্তেজনা দেখে রাজার মনে বোধহয় সাড় ফিরল। তিনি আমার সঙ্গে এসে মানুষটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে করতেই মানুষটার বুকে কান চেপে হৃদস্পন্দন শোনার চেষ্টা করলেন। একটু পরই মুখ তুলে বললেন, 'মৃত! সম্ভবত অনেক কাল আগেই মারা গেছেন। এক-দেড়শো বছর আগে হলেও আশ্চর্য হব না।'



শবদেহের মাথার কাছেই একটা চামড়ার ব্যাগ । এরকম অদ্ভুত আকারের ব্যাগ এর আগে কোথাও দেখিনি । রাজাও সেকথা বললেন । এও বললেন- ব্যাগের নকশা ও আকার দেখেই মানুষটির প্রাচীনত্ব অনুমান করেছেন তিনি । তাছাড়া গালের লতানো দাড়ির প্রান্তে ছোট্ট একটা গিঁট বাঁধা, সেটাও নাকি অষ্টাদশ শতাব্দীর মরক্কো-স্পেনের সীমান্ত অঞ্চলে কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যেত ।

বিনা দ্বিধায় আমরা ব্যাগের বড় বড় বোতাম-বন্ধ ঢাকনার সবকটি ধাতুর বোতাম একে একে ভেঙে ফেললাম । একটা বোতাম স্থায়ী ভাবে আটকেছিল, সেটাও ভাঙতে হল । ব্যাগের ভেতর সামান্য দুয়েকটা পশম ও চামড়ার পরিধেয়, একটা ত্রিফলা লম্বা ছুরি, হাতির দাঁত বা তিমির হাড়ের নকশা কাটা হাতলওলা । সবার নীচে একটা বড় মাপের পাতলা বই, পাতলা হলেও চামড়া বাঁধানো । পাতা হলদে হয়ে গেছে । প্রত্যেক পাতায় অদ্ভুত সব পাতা ফুল-ফলের জীবন্ত ছবি । হাতে আঁকা । রং এখনও উজ্জ্বল ।

বইটার নীচে একটা পুরনো বিবর্ণ সংবাদপত্রের ভেতরের একটা পাতা । তাতে তারিখ ছাপা আছে ঊনিশে সেপ্টেম্বর, ১৭১৯ ।

সবার নীচে একটা পাতলা পাথর । তাতে হাতির কানের মতো একটা বোঁটাসুদ্ধ বড় পাতার ফসিল । খবরের কাগজেও এই পাতার কাঠখোদাই ছবি ছাপা আছে । এরই হাতে আঁকা ছবি দেখলাম পাতলা বইটাতে ।

রাজা আবার তাঁর উদ্দীপনা নিয়ে বই, খবরের কাগজ ও প্রস্তরীভূত গাছের পাতায় ডুবে গেলেন ।

পরদিন ঝড়হীন তুষারমুক্ত আকাশের আলোয় গুহার ভেতরটা দিব্যি আলোকিত হয়ে উঠল । রাজা ঘুমিয়েছেন, না সারা রাত পাতার ছবি ও ফসিল নিয়ে জেগে কাটিয়েছেন

আমি জিজ্ঞেস করতে চাইলাম না। তাঁর সজাগ মনে উৎসাহ ফিরে এসেছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

সুযোগ বুঝে একসময় আমি বললাম, 'দেশে ফেরার শেষ একটা চেষ্টা আমাদের করা উচিত।'

তিনি উত্তর না দিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে গভীর ভাবে কিছু ভাবতে ভাবতে বললেন, 'এঁকে যদি বাঁচিয়ে তোলা যেত! কেবলই মনে হচ্ছে এঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। খবরের কাগজের লেখাটা পড়ে জানলাম এটা পড়েই এই পাতার খোঁজে ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন। এই পাতা নাকি একসময় শুধু আন্টার্কটিকায় পাওয়া যেত। অনেক কাল আগে, বলতে পারো প্রাচীন যুগের সাধুসন্তরা এই পাতায় নাকি মানুষের দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের গুণ আবিষ্কার করেছেন। এই হতভাগ্য এরই সন্ধানে এসে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। একে প্রণাম করো। তাঁর আবিষ্কার এই ফসিল আমরা দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও জিনবিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দেব। পাতার ফসিল থেকে ডি-এন-এ নিয়ে পৃথিবীতে আবার এই গাছ বা লতা সৃষ্টি করা যায় কিনা সেটা আমাকে দেখতেই হবে।

রাজাকে এভাবে আবার জীবনে ফিরতে দেখে নিশ্ছিদ্র বিপদের মধ্যেও মনে ক্ষীণ আশা জাগল।

হঠাৎ গুহার সামনে যেন বাজ পড়ল- 'মুখাঢম!' 'মুখাঢমম!' একসঙ্গে অনেকগুলো গলার ওই বজ্রগর্জনের পর পরই বন্দুকের আওয়াজ। কুকুরের ডাকও শোনা যাচ্ছে, তবে ভয়ার্ত স্বরের সে ডাক অতি করুণ। সংখ্যায়ও তারা অনেক কম মনে হল।

দস্যুদলের হুংকার সত্ত্বেও আমাদের একটা বড় সান্ত্বনা, গুহার মুখ একটানা প্রবল বরফবর্ষণে শুধু দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নয়, ঘনত্বেও অনেকটা বেড়ে দশ-পনেরো ফুট পুরু বরফের দেওয়াল হয়ে গেছে।

'মুখাঢম' আর গুলির শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। বরফের দেওয়াল ভাঙবার মরিয়া চেষ্টা আমাদের না মারা পর্যন্ত বোধহয় থামবে না।



১৫

গুহার বাইরে হাড় হিম করা মুখাঢঢম মুখাঢঢম আর গুলির শব্দ। থামবে বলে মনে হয় না। গুলি কি কখনও ফুরোবে না?

হঠাৎ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

রাজা বললেন, 'লক্ষণ ভালো নয়।'

'মুখাঢঢম' মানে কী, আপনি জানতে পেরেছেন?'

'আক্ষরিক অর্থ 'মৃত্যুদণ্ড'। এখানে ঠিক কী অর্থে বলছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হচ্ছে না। হয়তো আমাদের খুন করবে, তারই ঘোষণা।'

গুহামুখের দেওয়াল ফুটো হয়ে গেছে! ঠিক মাঝখানে সী-লায়নের মাথার সাইজের গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে ওয়েলডিং ল্যাম্পের মতো তীব্র অগ্নিচ্ছটা দেখা যাচ্ছে।

পাশেই বরফের দেওয়ালের ওপর থেকে আরেকটা আগুনের আভা ফুটছে।

রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে ছিলেন, হঠাৎ এক হ্যাঁচকায় আমাকে গুহামুখের দেওয়ালের নীচে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বন্দুকের গুলি ছিটকে এসে গুহার ছাদে গিয়ে লাগল। তারপর আরেকটা, পর পর এরকম গুলি চলল বেশ কিছুক্ষণ।

আমরা দেওয়াল ঘেঁষে একেবারে নীচে, গুহার এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে মেঝের ওপর শুয়ে আছি, গুলি আমাদের অনেক ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কুকুরের ডাক একদম থেমে গেছে। মুখাঢঢম ছাড়াও আরও কয়েকটা কথার টুকরো গুলির মতোই আছড়ে এসে পড়ছে।

ঝড়ের অবস্থা বা হাওয়ার গতি গুহার ভেতর থেকে বোঝবার উপায় নেই। অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দ শুনে মনে হয় ঝড় কিছুমাত্র কমেনি।

পাশাপাশি চারটে গর্ত থেকে একসঙ্গে একটানা গুলিবর্ষণ চলছে।

তাতেও আমাদের হদিশ না পেয়ে এবার দেওয়ালের নীচের দিকে গর্ত করার আগ্নেয় আভা দেখতে পাচ্ছি। দস্যুদলের হুংকারও এবার আরও ঘনঘন শোনা যাচ্ছে।

দেওয়ালের গর্তে বন্দুক রেখে ভেতরে গুলি ছোড়া যায়, কিন্তু পনেরো-কুড়ি ফুট পুরু গুহার ভেতর পর্যন্ত নল তো পৌঁছবে না। সেদিক থেকে এখনও আমরা নিরাপদ।

বিরাট দেওয়াল নড়তে শুরু করেছে। এ দেওয়াল ভাঙা বা সরানো জলদস্যুদের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

দেওয়াল অসম্ভব নড়ছে, ভেঙে পড়বে নাকি? যে-কোনও ভাবেই হোক দস্যুরা দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করছে না তো! তবে কি বিশেষ কোনও কৌশল আছে ওদের? বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতি?

ওদিকে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দও হঠাৎ বেড়ে গেল।

দেওয়ালের মাথার দিক থেকে বড় একটা বরফের চাঁই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ভাঙা দেওয়ালটা এসে পড়েছে। বন্দুকের নিশানা এড়াতে আমরা গুহার মুখে প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে ছিলাম বলে দেওয়াল চাপা পড়িনি, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি!

ছ-সাতজন দস্যু ভাঙা দেওয়ালের মাথায় উঠে এসেছে, আমাদের দেখতে না পেয়ে আন্দাজে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল।

বরফের দেওয়ালে পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে আছি, দস্যুদের নজর এড়িয়ে একবার মাথা তুললাম, মনে হল গুহার ভেতরে লাফিয়ে পড়বার তোড়জোর করছে।

পাশাপাশি আরও কয়েকটা মাথা দেখা গেল।

দেওয়াল ভেঙে পড়ার পর থেকে রাজা ওদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ নিজের লম্বা যন্ত্রটাকে দুহাতে তুলে ধরে বললেন, 'ওই দ্যাখো, অনেকগুলো দড়ি নামাচ্ছে, দড়ি বেয়ে গুহায় নামবে ওরা!'

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে পর পর বাজ পড়ল! পড়েই চলেছে। কিন্তু এ কী? আমাদের ঠিক সামনেই অনেকগুলো দেহ লুটিয়ে পড়ল। দু-তিনবার আর্তনাদ করে সবক'টা দেহ নিথর হয়ে গেল। দেওয়ালের মাথা খালি হয়ে গেছে।

বাজ পড়ার বিরাম নেই।

রাজা উৎকর্ণ হয়ে বাজের আওয়াজ শুনে বলে উঠলেন, 'বজ্রধ্বনি না! এ তো মেশিনগান! বা আরও মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্র!'

বজ্রপাতের শব্দের ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎই ঝড়ের তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ থেমে গিয়েছিল। এবার মেশিনগানের গুলিবর্ষণের শব্দ একটু থামতেই পাবলিক অ্যাড্রেসের মাইকে শোনা গেল- 'দোজ ইনসাইড দ্য কেভ, কাম আউট! রাইট নাও! কাম আউট!' (গুহার ভেতরে যারা আছো, বেরিয়ে এসো! এক্ষুনি বেরিয়ে এসো!)

কয়েকবার একই কথা। প্রতিবার আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। রাজার কপাল তীক্ষ্ণ ভাঁজে ভরে গেছে। মাইকে ঘোষণা শুনতে শুনতে বললেন, 'এরা আগের সেই দস্যুরা নয়, ইংরিজিতে ঘোষণা করছে, নতুন কোনও দস্যুদল? হয়তো ওদেরই দলভাঙা আরেকটা গোষ্ঠী। জলদস্যুদের মধ্যে এটা খুবই ঘটে। ধরা দেব, না বাঁচবার উপায় ভাবব?'

প্রশ্নটা আমাকে, না নিজেকে? আমি কী-ই বা বলব?

এইসময় আবার শোনা গেল 'আইদার কাম আউট অর উই উইল ক্রাশ দ্য ওয়াল!' (হয় বেরিয়ে এসো, নয়তো দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেব ।)

'রাজা, এরা যেই হোক, সারেন্ডার করা ছাড়া আর উপায় নেই!'

'পরিস্থিতির বলি হবার আগের মুহূর্তেও পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করতে হয় ।'

কথাটা বলেই ওপর থেকে ঝোলানো একটা দড়ি দু-তিনবার টান মেরে সেটা বেয়ে তিনি ভাঙা দেওয়ালের মাথায় উঠে গেলেন । গলার জোরে তাকে বলতে শুনলাম, 'হু আর ইউ? টেল মি, হু আর ইউ?'

বাইরে থেকে মাইকের চিৎকার ভেসে এল, 'ভয়েস অব দ্য কিং! ইউ আর অ্যালাইভ! ও মাই গড! উই আর ফ্রম ইওর কিংডম, ইওর এক্সসেলেন্সি!' (রাজার গলা! আপনি জীবিত! ও ভগবান! আমরা আপনার রাজ্য থেকে এসেছি, রাজাধিরাজ!')

'মাই অ্যাডমিরাল! আর ইউ?' (আমার নৌসেনাধ্যক্ষ! তাই তো?)

'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ । ছ সপ্তাহে ফিরে আসবেন বলে আপনি সম্পূর্ণ একা চলে এলেন, এতদিন আপনার কোনও খবর না পেয়ে দেশের সবাই উদ্বিগ্ন । সেনাবাহিনী অস্থির । আমাদের রেডিও-অফিসার দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়েও আপনার কোনও বার্তা পায়নি । 'পোলিয়ার্নো অরলোভা' জাহাজ-কোম্পানির চিঠি পেয়ে পুরো রাজ্য শোকে পাথর! ওদের চিঠিতে জানানো হয়েছে আন্টার্কটিকায় আপনার তুষারসমাধি হয়েছে ।'

'এখানকার খোঁজ পেলে কী করে?'

'আগে আপনাকে সুস্থ দেহে নামতে সাহায্য করি, তারপর সব বলব । তার চেয়ে বেশি শুনব । একচল্লিশ দিন ধরে আমরা আন্টার্কটিকার আকাশে চক্কর কেটে, তুষারপ্রান্তরে ঘুরে ঘুরে এত দিনে এই এলাকায় আসতে পেরেছি । আপনি ওখানে থাকুন, আমরা আপনাকে নামিয়ে আনছি ।'

ঝড় কমলেও গুহার ভেতরে এখন সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ের মতো প্রাণঘাতী ঠান্ডা হাওয়া অবিরাম আছড়ে পড়ছে । অনেকগুলো মৃতদেহের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে ছিলাম । রাজা দড়ি বেয়ে প্রথমে আমাকে তুলে নিলেন । তারপর তাঁর সেনাকর্তারা আমাদের দুজনকেই গুহার বাইরে নামিয়ে আনলেন ।

যে দুজন কথা বলছিলেন তাঁরা ছাড়াও আমাদের সামনে আরও সাতজন সেনা অফিসার । একটু আগেই দস্যুদলের সঙ্গে লড়াইয়ে চারজন মারা গেছে ।

রাজা প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করে কিছু একটা বুঝতে চাইছেন, নৌ সেনাধ্যক্ষের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার প্রধান সেনাধ্যক্ষ আসেননি?'

নৌ সেনাধ্যক্ষ উত্তর দিলেন, 'আপনার দুঃসংবাদে সম্প্রতি তিনি মানসিক বিষাদের শিকার । আপনি আপনার সেবককে নিয়ে বিমানে উঠে বসুন । বেশ কিছুক্ষণ আবহাওয়া শান্ত । যে-কোনও সময় আবার ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে ।'

‘তোমরা সবটাই সত্য বলছ?’

‘ভগবান বুদ্ধের নামে শপথ করে বলছি, রাজাধিরাজের সামনে মিথ্যা বলার কুমতি যেন কখনও আমাদের না হয়!’

রাজা আমার হাত থেকে তাঁর সুগন্ধির শিশি ও অমৃতকাঠির বাক্স রাখার ছোট্ট সুদৃশ্য থলেটা নিয়ে বললেন, ‘ইনি আমার সেবক নন, সহ-অভিযাত্রী।’

এই সুযোগে মনের কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি সেনাধ্যক্ষদের দিকে চেয়ে বললাম, ‘আবহাওয়া অনেকক্ষণ ধরে শান্ত আছে বলছেন, কিন্তু গুহা থেকে ঝড়ের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনেছি।’

‘ঝড়ের না, আকাশে আমাদের বিমানের শব্দ শুনেছেন হয়তো। এটা যুদ্ধবিমান। জরুরি প্রয়োজনে বায়ুসেনাধ্যক্ষের এটি বিশেষ বিমান।’

রাজা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন- ‘ইনি আমার এয়ার মার্শাল।’

বিমানে উঠে অ্যালুমিনিয়ামের মতো দেখতে একটা স্টিলের বাক্সের সিল খুলে রাজাকে ও আমাকে দু-রকম টিনের খাদ্য ও শুকনো ফল দেওয়া হল। রাজা শুধু দু-টুকরো ফল নিলেন, আমাকেও বেশি খেতে নিষেধ করলেন।

প্লেন ওড়বার জন্য রানওয়ের দরকার হল না। জমাট বরফের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে কিছুটা গিয়ে ওড়বার ঠিক আগে রাজা বলে উঠলেন, ‘থামো, বিমান থামাও। আমার মূল্যবান একটা জিনিস গুহায় ফেলে এসেছি, একটা ফসিল! আমাকে এনে দাও। পুরনো আমলের চামড়ার নকশা-আঁকা একটা ব্যাগ পাবে, তাতেই আছে। গুহার আলোয় ব্যাগটা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।’

সামনের সারিতে রাজার একপাশে বিমানবাহিনীর প্রধান, আরেকদিকে নৌবাহিনীর প্রধান।

বিমানবাহিনীর প্রধান প্লেন চালাচ্ছিলেন, ঘাড় না ঘুরিয়ে বললেন, ‘ইটস ইম্পসিবল নাও, ইওর এক্সসেলেন্সি।’ (এটা এখন অসম্ভব, মহারাজ।)





'ইউ মাস্ট স্টপ ।' (তোমাকে থামাতেই হবে!)

দুজনেই রাজার দুই রগে দুদিক থেকে দুটো রিভলবার চেপে ধরে বললেন, 'ইউ আর ডিথ্রোন্ড । আর্মি টুক ওভার ।' (আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করা হল । সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে ।)

প্লেন অনেকটা হাউয়ের মতো সোজা আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, উড়ছেও খুব দ্রুত গতিতে । রাজার মুখ অদ্ভুত থমথমে । এমনিতেই কানঢাকা টুপিটা খুলে ফেলায় অনেকক্ষণই তার চোখ মুখের চেহারা অন্যরকম লাগছিল, এখন যা দেখলাম তাতে পরের মুহূর্তগুলো ঠিক কীরকম হতে যাচ্ছে আমি কল্পনাতেও আনতে পারলাম না ।

কারও মুখে কথা নেই । পিছনের সারির সেনারাও পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে ।

একসময় রাজা গভীর স্বরে মাথা না ঘুরিয়ে দু-পাশের দুজনের উদ্দেশে বললেন, 'আমাকে মারতে হলে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালে কেন?'



'মৃত্যু নিশ্চিত করতে!'

'করো! বাঁচবার ইচ্ছেও আর আমার নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, আমার সঙ্গী ছেলেটির জীবন শেষ করে দিও না, ওকে ওর দেশে চলে যেতে দিও।'

আমার ঘাড়েও রাইফেল বা মেশিনগান ঠেকানো।

রাজা যেন পাথরের মূর্তি। মুখেও আর কথা নেই। শুধু বিমানের বিকট শব্দ। রাজার রগে নৌসেনাধ্যক্ষের রিভলবারের নল সাঁটা। রাজার দৃষ্টি সামনের জানলার ফাইবার গ্লাস ভেদ করে বাইরের পৃথিবীতে ভেসে আছে।

রাজা একসময় মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধানের দিকে অল্প ফিরে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'নীল হিরের খোঁজে পাগল সেই নাবিককে তোমাদের মনে আছে? জলদস্যুর লুকনো ধন-রত্নের খোঁজে বহুবার আন্টার্কটিকায় এসেছে। নীচে, ডানদিকে ওই সেই হিমবাহ, ওর গহ্বরে জলদস্যুর রত্নভাণ্ডার।'

'দস্যুর ধন-রত্নে এখন আমাদের আগ্রহ নেই। পরে এখানে নৌসেনা পাঠাব।'

'আমাকে মারবার আগে নীল হিরের খনি দেখতে চাও না? ওই খনিতে কয়েক হাজার ক্যারেটের নীল হিরেও আছে। তার বিচ্ছুরণে বহুদূর অব্দি নীল আভায় ভরে যায়। আমি তার সন্ধান পেয়েছি।'

রাজার দুপাশে দুজন চোখাচোখি করল।

বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ বললেন, 'এখান থেকে দেখাতে পারেন?'

'যেদিকে সূর্যাস্ত হবে, সেই দিক বরাবর চলো।'

'এখান থেকে পশ্চিমদিকে তিনশো সত্তর মাইলের মধ্যে সমুদ্রোপকূল। নীল হিরের খনি তার আগে, না পরে?'

রাজা ম্যাপটা তাঁর ও বাঁ-পাশের নৌসেনাধ্যক্ষের উরুর ওপর মেলে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ না তুলেই বিমানবাহিনীর প্রধানের উদ্দেশে বললেন, 'বিমান অন্তত ন'হাজার মাইল নীচে নামাও।'

'আমাদের বোকা ভাবলে আপনার মারাত্মক ভুল হবে!' পাইলটের উত্তর।

রাজা মনোযোগ দিয়ে যেমন ম্যাপ দেখছিলেন দেখতে লাগলেন । মাঝে দুবার চোখ তুলে জানলার বাইরের পৃথিবী দেখলেন ।

'এবার বিমান আরও নীচে নামাও ।'

'আপনার পিছনের সাতজনও সশস্ত্র, ভুলবেন না ।'

নৌসেনাধ্যক্ষের কথার পিঠেই বিমানসেনাধ্যক্ষের ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল- 'শুধু মহারাজাই প্রাক্তন, সশস্ত্র সেনারা সবাই বর্তমান!'

'নীল হিরের খনি দেখতে হলে বিমান আরও পাঁচ হাজার মাইল নামাও ।'

দুই সেনাধ্যক্ষ আবার চোখ চাওয়া-চাউয়ি করল ।

বিমানসেনাধ্যক্ষ ম্যাপের ওপর সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'দ্বীপটা ম্যাপে দেখাতে পারেন?'

'এই ম্যাপ তোমরা বুঝবে না ।' সামনের দিকে বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে রাজা বলেই চললেন, 'ওই যে কালো তিনটে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে উইটিবির মতো দেখাচ্ছে, ওগুলো সব আগ্নেয়গিরি । দুটো মরা, লক্ষ লক্ষ বছর আগে বহুবার ওখানে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে । তৃতীয়টি আজও জীবন্ত । ওই তিনটে পাহাড়ের একটার সঙ্গে আরেকটার প্রায় আশি থেকে একশো মাইলের ব্যবধান । একেবারে বাঁদিকের পাহাড়ের সামনে সমুদ্র থেকে কয়েক মাইল মসৃণ সমতল । লাভা জমাট বেঁধে ওইরকম হয়েছে । নীল হীরের খনি দেখতে হলে ওইখানে ল্যান্ড করতে হবে ।'

১৬

সমুদ্রের ঢেউ এসে জমাট লাভার ওপর যেখানে আছড়ে পড়ছে, তার কাছেই বিমান নামল । বিমান থেকে বাইরে আসার অনুমতি দেওয়া হল না, জানলা দিয়ে দেখলাম সমুদ্রকিনার বা দ্বীপের সৈকত বরাবর হালকা ধোঁয়া উঠছে ।

'এবার বলুন কোনদিকে এগোতে হবে?'

বিমানচালকের প্রশ্নে রাজা বাঁ হাত তুলে সবচেয়ে বাঁদিকের কালো পাহাড়ের দিকটা নির্দেশ করলেন ।

সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে জমাট লাভাস্রোতের ওপর বিমান চালাতে চালাতে নৌসেনাপ্রধান বললেন, 'আশা করি, এটা আপনার ফাঁদ নয়!'

বিমানসেনাধ্যক্ষ যোগ করলেন, 'এক্স হিজ-হাইনেসকে একটা গণ্ডমূর্খ ভাবলে নাকি হে? আমাদের ফাঁদে ফেলবার আগে আমাদের মেশিনগান তো ওঁর কাঁধ থেকে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেবে!'

রাজা শান্ত স্বরে শুধু বললেন, 'ইচ্ছে হলে আপাতত এখান থেকে ফিরে যেতে পারো । পরে উপযুক্ত লোকজন সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসে বিমান বোঝাই করে নীল হিরে দেশে নিয়ে যেতে পারবে ।'

'আগে সত্যতা যাচাই করতে চাই । এখানেই যদি নীল হিরের খনি, তাহলে এত কাছে এসেও কোথাও কোনও নীল আভা দেখছি না কেন?'

পাহাড়টার আরও কাছে এসে রাজার নির্দেশে বিমান থামানো হল । পুরো পাহাড়টাই পোড়া কয়লার মতো কালো । দূর থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বড় ও ছড়ানো ।

বিমান থেকে প্রথমে নামল সশস্ত্র সেনারা । নেমেই তারা হিসেব করে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ার পর আমার নামার আদেশ হল । সবশেষে নামানো হল রাজাকে । দুই সেনাধ্যক্ষ অত্যাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেমে এলেন । পাহাড়ের বাঁদিক ঘেঁষে অনেক দূর এগিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল পাহাড়ের কোলেই পর পর তিনটে গর্ত দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে । সাদা রঙের হালকা ধোঁয়া, ঠিক যেমন সৈকতে দেখেছি ।

আমাদের পিছনে ও দুপাশে সশস্ত্র সৈনিকরা । চারজনের হাতে বাগানো মেশিনগান, বাকিদের রাইফেল । দুই সেনাধ্যক্ষ চলেছে রাজার দুপাশে ।

নৌসেনাধ্যক্ষ হঠাৎ সশব্দে পা ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন- 'আর ইউ জোকিং উইথ আস?' (আমাদের সঙ্গে তামাশা করছেন?)

'ওই দ্যাখো, সাদা ধোঁয়ার মধ্যে নীল শিখা! দেখতে পাচ্ছ?'

'ও শিখা তো আগুনেরও হতে পারে! ধোঁয়া থাকলে তার ভেতর আগুন থাকেই!'

রাজা এবার তার নৌসেনাধ্যক্ষের চোখে চোখ রেখে দৃঢ় স্বরে বললেন, 'সংশয় শুধু সত্যের সন্ধানে হলেই ভালো, মিথ্যার মোহে হলে মারাত্মক!'

সেনাধ্যক্ষের চোখে আগুন জ্বলে উঠল । রাজার বুক-বরাবর মেশিনগান উঁচিয়ে গর্জন করে উঠল, 'নীল হিরে দেখাও, নইলে মরো!'

'আপাতত এইটুকু দেখে দেশে ফিরে তৈরি হয়ে আবার আসবে কিনা ভাবো ।'

এবার বিমানসেনাধ্যক্ষের গর্জন- 'তোমার ভাঁওতা ধরে ফেলেছি । বিমান নামিয়ে এখান থেকে পালাবার ছক কষছিলে, তাই না? এবার আমার বাহিনীর মেশিনগানের মুখোমুখি দাঁড়াও ।'

নৌসেনাধ্যক্ষের রগের শিরা দড়ির মতো দেখাচ্ছে । গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খনিটা এই মুহূর্তে দেখতে চাই!'

রাজা নির্বিকার । একইরকম শান্ত গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো । ধোঁয়ার গর্তগুলোর কাছেই নীল হিরের খনিমুখ ।'

কাছে এসে দেখা গেল প্রায় এক-দেড়শো ফুট চওড়া একটা ফাটল নীল আভায় ভরে রয়েছে । আন্টার্কটিকায় বরফের প্রাসাদে যাবার পথে বহু জায়গায় এরকম দেখেছি । সেগুলো আকারে এর চেয়ে অনেক গুণ বড় ।

আমাদের ওপর নজর রাখবার আদেশ দিয়ে সেনাদের প্রস্তুত থাকতে বলে দুই সেনাধ্যক্ষ ফাটলের ওপর যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়লেন । বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটাই যে হিরের খনি তার প্রমাণ কী? হিরে যে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'সেনাদের সামলাও ।' বলে রাজা ঝুঁকে ফাটলের মুখ থেকে ছোট দুটো আলগা টুকরো ভেঙে দুই সেনাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন, 'যাচাই করো । এ হল অপরিষ্কার কর্কশ চেহারা । পালিশ করলে এর আভায় চারদিক নীল হয়ে যাবে । তোমাদের হাতের তালুও দ্যাখো একটু যেন নীল হয়ে উঠছে!'



বোধহয় দশ মিনিটও কাটেনি, দুই সেনাধ্যক্ষের সাংঘাতিক অগ্নিবর্ষী অস্ত্র আমাদের চোখ অন্ধকার করে গর্জন করে উঠল । কয়েক সেকেন্ড পর চোখ ধাঁধানো আলোর সঙ্গে কান ফাটানো আওয়াজ বন্ধ হতেই দেখলাম সাতজন সৈনিকেরই দেহ নিস্পন্দ পড়ে আছে ।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে সেনাধ্যক্ষদের কাছ থেকে আকস্মিক একঝাঁক গুলিবর্ষণে হতভম্ব সৈনিকরা আমাদের ওপর থেকে লক্ষ্য সরিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাই করতে পারেনি । মাত্র দুজন সৈনিক লুটিয়ে পড়বার আগেই গুলি ছুঁড়েছিল, দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল । নৌসেনাধ্যক্ষের মাথার ওপর একটা বড় স্কুবা পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছিল, একজনের গুলিতে পাখিটা কিছুদূর গিয়ে ডানা ছেতরে পড়ে গেল ।

রাজার গম্ভীর কণ্ঠ শুনলাম, ‘নিরপরাধ সৈনিকদের হত্যা করলে কেন?’

‘নীল হিরের খনির সাক্ষীদের বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না ।’

‘নিরপরাধকে হত্যা করার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য । আজ হোক, কাল হোক, শাস্তি তোমরা পাবেই!’

‘এই খনির সাক্ষী রাখতে চাই না । এবার তোমাদের পালা । তার আগে বলো, এর হদিশ আর কেউ জানে? কোনও অভিযাত্রী বা দস্যুদল?’

‘জীবিত কেউ-ই জানে না । জলদস্যুর দল এর খোঁজে আজও পাগল হয়ে ঘুরছে । এখনও খবর পায়নি ।’

‘তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না?’

‘শুধু একজন । প্রাচীনকালের এই ম্যাপ যিনি বানিয়েছেন ।’

নৌসেনাধ্যক্ষ এর মধ্যে ফাটল থেকে অনেকগুলো নীল হিরের ছোট ছোট চাঙর তুলে নিয়েছে। সেগুলো পাশেই জড়ো করে ফাটলের মধ্যে দুহাত গলিয়ে এবার পাথরের বড় একটা চাঙর ভাঙবার চেষ্টা করছে।

ঘাড় তুলে বিমানসেনাধ্যক্ষের কাছে সাহায্যের ইঙ্গিত করতেই বিমানসেনাধ্যক্ষ হাত লাগাল। দুজনে প্রাণপণে বড় একটা নীল হিরের চাঙর অনেকটা আলগা করে ফেলেছে, হঠাৎ রাজা আমাকে চোখের ইঙ্গিতে একটা নির্দেশ দিয়ে এক ধাক্কায় একজনকে গহ্বরের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমিও সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষকে মোক্ষম ধাক্কা দিলাম। দুজনের বুক কাঁপানো দীর্ঘ আর্তনাদ যতক্ষণ না অতলে তলিয়ে গেল ততক্ষণ আমরা দুজন নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এত সব সাংঘাতিক ঘটনার ধাক্কা সামলিয়ে একসময় রাজাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই দ্বীপে নীল হিরের খনি আছে আপনি জানলেন কী করে? আপনার ম্যাপে এখানকার পথ দেখানো আছে?’

‘ম্যাপে দ্বীপটার উল্লেখ আছে মৃত আগ্নেয়গিরির দ্বীপ হিসেবে। এরকম একটা দ্বীপ জাহাজে আসবার সময় পথে পড়েছিল, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? এটা তার চেয়ে বহু গুণ বড়। একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির কারণে এখান থেকে ধোঁয়া ওঠে। এই দ্বীপের আরেকটা নাম ফাটলের দ্বীপ। ছোটবড় অসংখ্য ফাটল এখানে। গভীর ফাটল থেকে নীল আভা বেরয়।’



এই দ্বীপে বেশ গরম। দুজনেই আমরা গায়ের পার্কা ইত্যাদি খুলে ফেলেছি। ভালোই হল দস্যুর চামড়ার ওভারকোট গুহাতেই পড়ে আছে। তবে গুহায় ফেলে আসা প্রাচীনকালের পাতার ফসিলটার জন্য শুধু রাজার না, আমারও আফশোস হচ্ছিল। তাঁরই

নির্দেশে বিমানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর দীর্ঘশ্বাস কানে এল। প্রাগৈতিহাসিক ওই পাতার জন্য তাঁর শোক অনুমান করা যায়।

যেটা আমার সব অনুমানের বাইরে, সে-বিষয়ে আমি প্রশ্নটা করেই ফেললাম, 'নীল হিরের খনি এই দ্বীপেই আছে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে?'

'দ্বীপটার বিষয়ে জানতাম। প্রচুর ফাটলের কথা জানতাম। বাকিটা ঝুঁকির ব্যাপার। নীল হিরের খনি আন্টার্কটিকায় আছে বলে শুনিনি, কোথাও পড়িওনি কখনও, ওটা তো সেই জলদস্যুদের কল্পনা। তুষার সাম্রাজ্যের নীল হিরের কথা তো দৈত্যের মতো চেহারার জলদস্যুটার মুখেই প্রথম শুনলাম!'

আমি ভাবছি দেখে রাজা আবার বললেন, 'আমার অমানুষ সেনাধ্যক্ষদের মতো তুমিও ওগুলো নীল হিরে ভাবলে!'

'ওগুলো নীল হিরে নয়? আপনিই তো খনিমুখ থেকে খসিয়ে হিরের টুকরো ওদের দেখালেন?'

'ক্যালসাইট পাথরকে লোভের চোখে ওরা নীল হিরে বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। এই দ্বীপের অধিকাংশ ফাটলই এরকম ক্যালসাইট ফেটে তৈরি হয়েছে। আর ফাটলের ওই নীল আভা আসলে অতি প্রাচীন হিমবাহের সেই নীল রং। আন্টার্কটিকার মতো রহস্যময়, বরফ ঢাকা মহাদেশে হালকা নীল রঙের এই পাথরের ফাটল ধন-সম্পদের কাঙাল যারা তাদের কাছে নীল হিরের খনি তো মনে হবেই!'

রাজা ভুল করে বা অভ্যাস বশে বিমানে উঠতে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম, 'আপনার পাইলট তো এখন নীল হিরের খনিতে!'

'উঠে এসো। সৈকত ধরে গাড়ির মতো চালিয়ে যতদূর যাওয়া যায় যাব- যদি কোনও জাহাজের দেখা পাই। এয়াররুট জানা থাকলে দেশ পর্যন্ত উড়তেও পারতাম!'

বিমান চলছে ধীরে ধীরে। ঘন্টায় কুড়ি-তিরিশ মাইলের বেশি না। সৈকত যেখানে সরু ও এবড়ো-খেবড়ো সেখানে প্রায় হেলে-দুলে এগোচ্ছে।

অনেকক্ষণই তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। খিদেয়ও গা গুলোচ্ছে। যে থলির মধ্যে রাজার অমৃতকাঠির বাক্স ও ফুলের গন্ধ ভরা শিশি আছে সেটা তাঁর পার্কার ভেতরের পকেটে ছিল। পার্কাটাই কালো পাহাড়ের কোলে পড়ে আছে, চলে আসবার সময় আর নেওয়া হয়নি।

কালো দ্বীপটার এই দিকটা বরফে ঢাকা। এই অংশের সৈকতও জমাট তুষার। চোখের সামনে অসীম সমুদ্র, কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার বা গলা ভেজাবার মতো এক ফোঁটা জলও কোথাও চোখে পড়ল না।

আরও খানিক এগিয়ে রাজা বিমান থামালেন। আমাকে নামতে দিয়ে নিজেও নামতে নামতে বললেন, 'পশুপাখি মানুষ কেউই জল ছাড়া বাঁচে না। সমুদ্রের জল খেতে পারবে

না, বরফ ভেঙে মুখে দাও। জিভে নিয়ে যতক্ষণ পারো নাড়াচাড়া করো।'



বরফে জিভ অল্পক্ষণেই অসাড়, তবু জল পেয়ে প্রাণ ঠান্ডা হল।

পেট্রোল পাখির ঝাঁক সমুদ্রের জলে ভেসে চলেছে, আমাদের মাথার ওপরও পেট্রোল পাখির ঝাঁক। পাখিদের ওড়বার গতিমুখ বা দিকনির্বাচন দেখতে দেখতে রাজা বললেন, 'স্থলভূমির দিকে হয়তো আমরা এগোচ্ছি।'

এখানেও সৈকতজুড়ে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক ঢেউয়ে ভেসে এসে সারি সারি মরে পড়ে আছে। ছোট চিংড়ির মতো দেখতে।

রাজা বললেন, 'সেই ক্রিল, পেঙ্গুইনদের প্রিয় খাদ্য। খিদেয় খুব কষ্ট হলে তুমিও খেতে পারো।'

হাতে একমুঠো নিয়েও মুখে তুলতে গিয়ে বমি করে ফেললাম। উৎকট আঁশটে গন্ধ।

আমার মাথা এমন ভীষণ রকম ঘুরছে যে ভয় পেয়ে গেলাম- মরে যাচ্ছি না কি? বুক পেট মুচড়ে বমি হতে চাইছে, কিন্তু বমি হচ্ছে না। অসহ্য কষ্টে আমি বরফের ওপর শুয়ে পড়লাম। গায়ে পার্কা নেই, পিঠ ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে, কিন্তু সে-কষ্ট খুব একটা টের পাচ্ছি না।

রাজা নিচু হয়ে বসে আমার হাতের নাড়ি ধরে, চোখের পাতা টেনে, বুকে কান চেপে কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলেন, তারপর রোদে পোড়া একমুঠো চিংড়ির মতো সেই মাছ আমার নাক টিপে ধরে আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন।

'চিবোও, ভালো করে চিবোও।'

বার কতক এভাবে শুকনো ক্রিল চিবিয়ে আমি একটু একটু করে বেঁচে উঠলাম। উঠে বসে আমি নিজেও রোদে শুকনো চিংড়ির মতো সেই ক্রিল মুঠোমুঠো খেয়ে যেন এবার প্রাণ ফিরে পেলাম। পাছে বমি হয়ে যায় তাই প্রতিবারই ক্রিল মুখে দেবার সময় বাঁ-হাতে নাক টিপে ধরি।

সমুদ্রের দিক থেকে হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে লাগল। রাজা বিমানের গতি বাড়িয়ে দিলেন। দুঘন্টাও হয়তো কাটেনি, ঝাঁকুনি খেয়ে বিমান থেমে গেল। সামনেই সৈকতরেখা শেষ। সরু হয়ে দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে ডানদিকে ঘুরে গেছে। আর এগনোর উপায় নেই।

এখানেই আমরা গুনে গুনে সাঁইত্রিশ দিন আটকে থাকলাম। বরফ ভেঙে বা তুষার আঁচড়ে নিয়ে তৃষ্ণার জল আর খুব খিদেয় শরীর ভেঙে এলে রোদে শুকনো ক্রিল মাছ- শুধু এইটুকু সম্বল করে আমাদের একেকটা দিন কাটে। রাত কাটে বিমানে। অসীম সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ব্যথা হয়ে যায়, দুচোখ জ্বালা করে জল পড়ে। কোথায় জাহাজ!

এদিকে আন্টার্কটিকায় গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শীত আসছে, নাকি শীত শুরুই হয়ে গেল! কিছুদিন ধরেই দেখছি, আকাশে ভোরের লাল রং ছড়িয়ে পড়ার দু-তিন ঘন্টার মধ্যেই তারায় সারা আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে! শীতকালেই তো এমন হয় এখানে! শরীরের রক্ত-সঞ্চলন চালু রাখতে প্রতি মুহূর্তের লড়াই আর কত দিন বা কতক্ষণ চালাতে পারব জানি না। না আকাশে একটা বিমান, না সমুদ্রে একটা জাহাজ! স্বর্গীয় সংগীত আর অপরূপ নীলের রাজ্যে এক আশ্চর্য গোপন সভ্যতা স্বচক্ষে দেখেও পৃথিবীর কাউকে সেকথা বলা হবে না ভেবে মাঝে মাঝেই আমার বুক তোলপাড় করে ওঠে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুধু প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে সমুদ্রের বুকে শেষ পর্যন্ত একদিন একটা ছোট জাহাজের দেখা পেয়ে উত্তেজনায় আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার জোগাড়! পরে জেনেছি রাজা পাহাড়ের ঢালুর ওপর বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে তাঁর সেই যন্ত্র প্রবল হাওয়ার মুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অদ্ভুত সব সংকেত পাঠিয়ে জাহাজের নাবিকদের নজর এদিকে ঘোরাতে পেরেছিলেন।

জাহাজটা চিলির বিজ্ঞানীদের। সেই জাহাজে শেষ পর্যন্ত কীভাবে চিলির পুন্তা আরেনাস পৌঁছলাম, সেখান থেকে তাঁদেরই সাহায্যে উশুয়াইয়ায় ফিরে এলাম, সে এক দীর্ঘ কাহিনি। পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট সঙ্গে থাকায় উশুয়াইয়া থেকে বুয়েনস আইরেস, সেখান থেকে সাওপাওলো, তারপর জোহানেসবার্গ হয়ে ভারতে ফিরতে বড় কোনও অসুবিধা হয়নি। শুধু উশুয়াইয়ায় এয়ারলাইন্সের অফিসে লিখিত আবেদন করে আমার বাতিল হয়ে যাওয়া টিকিট বদলে নিতে হল। উশুয়াইয়া ও বুয়েনস আইরেসের টিকিট ১ জানুয়ারির বদলে ১৫ মে আর সাওপাওলো ও জোহানেসবার্গের টিকিট ২

জানুয়ারির বদলে ১৬ মে করে নিতে হল । রাজাকে সেটুকুও করতে হল না, তাঁর ওপেন টিকিট, এই টিকিটে তিনি যেদিন খুশি যাত্রা করতে পারেন ।

সাওপাওলো বিমানবন্দরে বিদায় নেবার সময় রাজা আমাকে আকস্মিক আবেগে আলিঙ্গন করে কিছুক্ষণ ধরে থাকলেন, তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সেই আশ্চর্য সংগীতের স্রষ্টাদের কথা কখনও ভুলো না ।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন, 'আমার প্রধান সেনাধ্যক্ষকে সম্ভবত গৃহবন্দি করা হয়েছে । আমার আর এক মুহূর্ত সময় নেই ।' হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে সেখান থেকেই তাঁর নিজের দেশের বিমানে ওঠবার গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন । তার আগে তাঁর পুরো নাম, যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি আচার্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, তাঁর রাজ্যের নাম ও তাঁর বিদেশ-সচিবের ফোন নম্বর লেখা একটা কার্ড দিয়ে এগারোই নভেম্বর আমাকে তাঁর দেশে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন । এগারোই নভেম্বরই কেন, সে-বিষয়ে কিছু জানা হল না ।

তাঁর হাত থেকে কার্ডটা নেবার সময় নতমস্তকে করজোড়ে রাজাকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'এভাবে আবার আপনার সাক্ষাৎ পাব ভাবিনি কখনও । এবার এযুগের সত্যিকার রাজাকে নিয়ে রূপকথা আমাকে লিখতেই হবে । আপনার নিমন্ত্রণ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম ।'

'আমার রাজ্যে তুমি সবসময় স্বাগত । যতদিন ইচ্ছে তুমি আমার দেশে থাকতে পারো । আমার বিদেশ-সচিবকে তোমার আসার তারিখ জানালে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন ।' বিমানে ওঠবার আগে এই ছিল তাঁর শেষ কথা ।

কলকাতায় ফিরে দেখি এক্সপিডিশন-সংস্থা জাহাজে ফেলে আসা আমার সব খোলা জিনিসপত্র পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে আমার এক্সপোজড সাতটা ক্যাসেটও আছে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম । জামাকাপড় বইপত্রের তালাবন্ধ বাক্সটাও এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়েছেন । সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়েছেন- তাঁরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেসর অমুক তাঁর এক সঙ্গী সমেত একটা দ্বীপে নেমে গিয়ে জাহাজে আর ফিরতে পারেননি । অসীম তুষাররাজ্যে হারিয়ে গিয়ে এই দুজন অভিযাত্রীর দুঃখজনক তুষারসমাধি হয়েছে । আর যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী শবদেহ ফিরিয়ে আনা সংস্থাটির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, তাই তাঁরা আরও একবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ জানাচ্ছেন ।

তাঁদের দায়িত্ববোধের অন্য একটি খবর পড়ে ভালো লাগল । তাঁরা জানিয়েছেন, সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়া জর্ডনের ওমর রহমানকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ করে উশুয়াইয়ায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন । এর পরের খবরে চোখ পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল- বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের অনুতাপে দগ্ধ আফগানিস্তানের

মানুষটি জাহাজেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, তাঁর দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

সবশেষে বাঁকা হরফে লেখা- এই চিঠি সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী জাহাজের সব যাত্রীর ঠিকানায় পাঠানো হল ।



শেষ কথা

সে-বছরের পরের বছর দশই নভেম্বর বিমানে চড়ে বসলাম । বিমানের ছোট স্ক্রিনে আমাদের দেশ থেকে রাজার দেশের দূরত্ব যতই কমে আসতে দেখছি আমার মনের মধ্যে ততই তোলপাড় হচ্ছে । গত প্রায় দেড় বছরে থেকে-থেকেই মনে পড়েছে নীলাভ বরফনগরের সেই অলৌকিক দৃশ্য আর স্বর্গীয় সুরধ্বনি । তবে তার চেয়ে বেশি মনে পড়ে রাজাকে । তাঁর মুখের ভাব, মনের কথা কখনও ভুলতে পারব বলে মনে হয় না ।

রাজার দেশের বিমানবন্দরে প্লেন নামল ভোরবেলা । বিমান থেকে নেমে দেখি দুজন রাজকর্মচারী ইংরিজিতে আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । আমি এগিয়ে যেতে দুজনেই ভারতীয় রীতিতে বুকের কাছে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করলেন । আমাকে খুব সুন্দর একটা গাড়িতে তুলে জানালেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আমার জন্য প্রাসাদে অপেক্ষা করছেন ।

প্রাসাদের তোরণদুয়ার থেকে আরেকজন রাজকর্মচারী আমাকে নিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে রওনা হবার আগে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপের সৌভাগ্য হয়েছে । আসুন, প্রধানমন্ত্রী আপনাকে স্বাগত জানাবেন ।'

আনন্দে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে বুঝতে পারছি । রাজার দর্শন পাবার জন্য আমি মনে মনে খুবই চঞ্চল । হয়তো সবার শেষে তিনি দর্শন দেবেন ।

প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর পাশের আসনে বসিয়ে বললেন, 'আপনি স্বয়ং মহারাজের অতিথি । মহারাজের প্রাসাদ ও তাঁর প্রিয় দেশ ঘুরে দেখে আপনি আপনার রূপকথা লেখা শুরু করা যায় কিনা দেখুন ।'

আমি অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম, 'প্রথমে মহারাজার দর্শন পেতে চাই ।'

প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর একটা খুব ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আন্টার্কটিকার গভীরে তিনি নাকি এক নীলাভ বরফনগরে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন এক আশ্চর্য সভ্যতা দেখে এসেছেন । হয়তো অলৌকিক কিছু দেখেছেন । তারই সন্ধানে এবার চিরকালের জন্য দেশ ত্যাগ করেছেন । যাবার আগে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে রাজ্যশাসনভার আমার কাঁধে চাপিয়ে গেছেন । আপনাদের দেশের রামায়ণ মহাকাব্যের মতো তাঁর পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে আমি রাজ্যের দায়িত্ব পালন করছি মাত্র । আমি ছিলাম তাঁর প্রধান সেনাধ্যক্ষ । আপনি যতদিন

খুশি আমাদের দেশে মহারাজের বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকুন। আপনার রূপকথা লেখার ব্যাপারে যা কিছু দেখতে চান, জানতে চান অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন।'

একথা শুনে আমাদের সময়ের রাজাকে নিয়ে রূপকথা লেখার ইচ্ছে আমার মন থেকে মুছে গেল। মাত্র কয়েকদিনে দেশটা দেখে ফিরে এলাম।

আজও প্রতি বছর এগারোই নভেম্বর সে-দেশে যাই। যদি রাজা ফিরে আসেন!

তিনি আর কোনওদিন ফেরেননি।

